ফরযে কেফায়া পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। যেমন অধিকাংশ শহরে মুসলমান চিকিৎসক নেই, যার সাক্ষ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে শরীয়তের আইনে গ্রাহ্য হয়। অথচ ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে কারও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি উৎসাহ নেই।

অনুরূপভাবে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি ফরযে কেফায়া। যারা মোনাযারা করে, তাদের অধিকাংশই মোনাযারার মজলিসে রেশমী পোশাক অথবা রেশমী ফরাশ বিছানো দেখে। অথচ সে এমন বিষয়ে মোনাযারা করে, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যদিও থাকে, তবে তার বর্ণনাকারী থাকে অনেক। এরপরও তারা বলে, তারা ফরযে কেফায়ায় মশগুল হয়ে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য কামনা করে। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কখন বর্জিত হবে? তিনি বললেন ঃ "যখন তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেবে, বড়দের মধ্যে নির্লজ্জতা ও ছোটদের মধ্যে রাজত্ব চলে আসবে এবং নীচদের মধ্যে ফেকাহ্ তথা ধর্মীয় জ্ঞান।"

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যে মোনাযারা করবে তার মুজতাহিদ হতে হবে। অর্থাৎ নিজের অভিমত অনুসারে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রঃ) প্রমুখের মযহাবের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ফতোয়া দেবে না। এমনকি, সে যদি সত্য বিষয়টি ইমাম আযমের মযহাব থেকে জানতে পারে, তবে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য বর্জন করবে এবং সত্য যা জানবে তদনুযায়ী ফতোয়া দেবে। সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণ তাই করতেন। যেব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হয়, তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সে তার ইমামের উক্তি বর্ণনা করে দেয়। তার ইমামের মযহাবে কিছু দুর্বলতা জানতে পারলে সে তা বর্জন করে না। এরূপ ব্যক্তির মোনাযারায় ফায়দা নেই।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা এমন বিষয়ে করবে, যা হয়ে গেছে অথবা সত্বরই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এমনি ধরনের ঘটনাবলীতে পরামর্শ করেছেন, যা নতুন সংঘটিত হত অথবা প্রায়ই সংঘটিত হত। যেমন, ফরায়েযের বিষয়সমূহ। কিন্তু আজকাল যারা মোনাযারা করে, তাদেরকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যেসব ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই লিপ্ত হয়, সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে তারা প্রয়াস চালায় না; বরং এমন ব্যাপার তালাশ করে, যাতে কোন না কোন দিক দিয়ে বিবাদের অবকাশ থাকে। যেসকল ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে, সেগুলো প্রায়ই ছেড়ে দেয়া হয় এবং বলা হয়, এ বিষয়টি হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অথবা এটা নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার। আশ্চর্যের বিষয়, উদ্দেশ্য তো সত্যানুসন্ধান, অথচ হাদীসের দোহাই দিয়ে বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয় অথবা ছোটখাট বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়! সত্য বিষয়ে তো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে অভীষ্টে পৌঁছে যাওয়াই কাম্য হয়ে থাকে। দীর্ঘ আলোচনা কাম্য নয়।

পঞ্চম শর্ত, মজলিসে এবং আমীর ও শাসকদের সামনে মোনাযারা করা অপেক্ষা নির্জনতায় ও একান্তে মোনাযারা করা উত্তম মনে হতে হবে। কেননা, নির্জনতায় সাহস, চিন্তা-ভাবনা একত্রিত ও পরিষ্কার থাকে এবং সত্য বিষয় দ্রুত অনুধাবন করা যায়। পক্ষান্তরে লোকজনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হয়ে যায়– সত্যপন্থী হোক বিংবা মিথ্যাপন্থী। সকলেই জানে, এখন মোনাযারাকারীরা মজলিস ও জনগণের সমাবেশেই বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে অধিক আগ্রহী। একজন অন্যজনের সাথে বহু দিন থাকে, কিন্তু একান্তে কোন বক্তৃতা দেয় না; কিংবা একজন কিছু জিজ্ঞেস করলে অন্যজন জওয়াব দেয় না। যদি কোন আমীর ব্যক্তি উপস্থিত থাকে অথবা জনসমাগম হয়, তবে বক্তৃতার কোন দিক বাকী রাখে না, যাতে প্রমাণিত হয়, সে একজন জবরদস্ত বক্তা।

ষষ্ঠ শর্ত, সত্য বিষয়ের অন্বেষণে এমন অবস্থা হতে হবে, যেমন কেউ হারানো বস্তু অন্বেষণ করে। হারানো বস্তুটি তার হাত দিয়ে পাওয়া যাক বা অন্যের হাত দিয়ে– তাতে কোন পার্থক্য থাকে না। বিতর্কে নিজেকে প্রতিপক্ষের সাহায্যকারী মনে করতে হবে; বিপরীত ও শত্রুপক্ষ নয়। সে ভ্রান্তি প্রকাশ করে দিলে অথবা সত্য বিষয় বলে দিলে তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। উদাহরণতঃ হারানো বস্তুর অন্বেষণে যদি কেউ এক পথে চলতে থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্য সড়কে যেতে বলে, তবে সে সেই ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধন্যবাদ জানায়। তাকে মন্দ বলে না; বরং তার প্রতি খুশী হয়। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শের অবস্থা তাই ছিল। সেমতে এক মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষণের মধ্যে বাধা দিয়ে তাঁকে সত্য বিষয় অবগত করালে তিনি বললেন ঃ মহিলা ঠিক বলছে এবং পুরুষ

(অর্থাৎ, আমি) ভুল করেছি। অন্য এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জওয়াব দিলেন। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, মাসআলাটি এরূপ নয়; বরং এরূপ। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ তোমার কথাই ঠিক। আমি ভুল করেছি। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরও জ্ঞানী রয়েছে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে সে কথা বলে দিলেন যা থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু মূসা বললেন ঃ যতদিন এ আলেম তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। ঘটনাটি এই ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং মারা গেল। তার কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন ঃ 'সে জান্নাতে থাকবে।' তখন আবু মূসা (রাঃ) কূফার শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) প্রশ্নকারীকে বললেন ঃ আমীরকে পুনরায় জিজ্ঞেস কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার প্রশ্ন বুঝেননি। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস কললেন। আমীর আবারও একই জওয়াব দিলেন। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন ঃ আমি বলি, যদি সে মারা যায় এবং সত্যে পৌঁছে থাকে, তবে জান্নাতী হবে। হযরত আবু মূসা বললেন ঃ আপনার কথাই ঠিক। বাস্তবে সত্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ন্যায়সঙ্গত কথাই বলা উচিত। আজকাল এ ধরনের কথা কোন সামান্য ফেকাহবিদের কাছে কেউ বর্ণনা করলেও সে মানবে না; বরং বলবে– এ মাসআলায় সত্যে পৌঁছার কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এটা সবাই জানে। মোট কথা আজকালকার মোনাযারাকারীদেরকে লক্ষ্য কর, যদি প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ পায়, তবে তাদের মুখমণ্ডল কেমন কাল হয়ে যায়। এরপর গোপনে গোপনে যতদূর সম্ভব, এ সত্য অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যেব্যক্তি তাদেরকে অভিযুক্ত করে, তারা সারা জীবন তার নিন্দা চর্চা করতে থাকে। তার পরও মোনাযারায় নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ বলতে তাদের লজ্জা করে না।

সপ্তম শর্ত, মোনাযারায় শরীক ব্যক্তি যদি এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণের দিকে যায় এবং এক আপত্তির বদলে অন্য আপত্তি পেশ করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোনাযারা এরূপই হত। বিতর্কের নবাবিষ্কৃত সূক্ষ্ম বিষয়াদি তাদের মোনাযারায় অনুপস্থিত ছিল। কেননা, সত্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সর্বদাই

মিথ্যার বিপরীত হয়ে থাকে। আর সত্য বিষয় কবুল করা ওয়াজেব। অথচ মোনাযারার মজলিসে দেখা যায়, সারাক্ষণ একে অপরের কথা খণ্ডনে এবং বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি তার ধারণায় কোন মূল বিধানের একটি কারণ বর্ণনা করলে অন্য ব্যক্তি জওয়াব দেয় ঃ মূল বিষয়ে এ বিধান হওয়ার কারণ এটিই, এর প্রমাণ কি? উত্তরে সে বলে ঃ আমার তো তাই মনে হয়। তুমি যদি অন্য কোন সুস্পষ্ট কারণ জান, তবে বর্ণনা কর। আমিও ভেবে দেখব। এরপর আপত্তিকারী পীড়াপীড়ি করে বলে ঃ কারণ অন্যটি; আমি তা জানি কিন্তু বলব না। কেননা, বলা আমার জন্যে জরুরী নয়। এরপর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে তা বর্ণনা করে না এবং মোনাযারার মজলিসে হট্টগোল হতে থাকে। আপত্তিকারী ব্যক্তি বুঝে না যে, 'আমি জানি কিন্তু বলব না'– তার একথা 'শরীয়ত বিরোধী' মিথ্যার নামান্তর। কেননা, যদি বাস্তবে কারণটি তার অজানা থাকে এবং কেবল প্রতিপক্ষকে অপারগ করে দেয়ার জন্যে জানার দাবী করে, তবে সে ফাসেক, মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্র নাফরমান এবং তাঁর ক্রোধের পাত্র। পক্ষান্তরে যদি সে আপন দাবীতে সত্যবাদী হয়, তবুও সে ফাসেক। কারণ, সে একটি জানা শরীয়তগত বিষয় গোপন করে। অথচ তার মুসলমান ভাই তা জেনে চিন্তাভাবনা করার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস করছে। এটা সর্ববাদিসম্মত কথা যে, মানুষ ধর্মের যা কিছু জানে, কারও জিজ্ঞাসার পর তা বলা ও প্রকাশ করা ওয়াজেব। এখন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের বক্তব্য দেখে বিচার করা দরকার, তাদের মধ্যে এ ধরনের বিষয় শুনা গেছে কি? তাদের কেউ কখনও এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণে যেতে নিষেধ করেছেন কি? তারা কি কিয়াস ছেড়ে সাহাবীর উক্তি অবলম্বন করতে এবং হাদীস ছেড়ে আয়াত অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন? তাঁদের সকল মোনাযারা এমন হত যে, তাঁরা অন্তরে যা চিন্তা করেছেন, মুখে হুবহু তা বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা নিয়ে সকলে মিলে চিন্তাভাবনা করেছেন।

অষ্টম শর্ত, মোনাযারা এমন ব্যক্তির সাথে করতে হবে, যার কাছ থেকে উপকার আশা করা যায় এবং যে জ্ঞানের বিষয়ে ব্যাপৃত। আজকাল প্রায়শঃ দেখা যায়, যারা মোনাযারা করে তারা বড় বড় আলেমের সাথে মোনাযারা করতে ভয় পায়। আশংকা এই করা হয় যে, সত্য বিষয় তার মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লে মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা ফাঁস হয়ে

পড়বে। ফলে যারা অজ্ঞানী তাদের সাথে মোনাযারা করার উৎসাহ বেশী দেখা যায়, যাতে তাদের সামনে বাতিলকেই সপ্রমাণ করা যায়।

মোনাযারার এই আটটি শর্ত ছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শর্ত রয়েছে, কিন্তু এই আটটি শর্ত দ্বারাই তুমি মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে, সে আল্লাহ্র জন্যে মোনাযারা করে না অন্য কোন কারণে। সারকথা, শয়তান মানুষের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। বাস্তবে শয়তান হল মানুষের সর্ববৃহৎ দুশমন ও ধ্বংসকামী। যেব্যক্তি এই শয়তানের সাথে মোনাযারা করে না এবং অন্য লোকের সাথে এমন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মোনাযারায় প্রবৃত্ত হয়, যাতে ইজতিহাদকারী সত্য বিষয়ে পৌঁছে অথবা সত্য বিষয়ে পৌঁছার সওয়াবে অংশীদার হয়, সে শয়তানের ক্রীড়নক এবং খাঁটি লোকদের জন্যে একটি শিক্ষা।

মোনাযারা থেকে উদ্ভূত বিপদ

প্রকাশ থাকে যে, নিজে প্রবল হওয়া, অপরকে নিশ্চুপ করা, নিজের গুণগরিমা প্রকাশ করা, মানুষের মধ্যে শুদ্ধভাষিতা, বাগ্মিতা ও গর্ব প্রদর্শন করা এবং মানুষের মন নিজের দিকে আকৃষ্ট করা ইত্যাদি হীন উদ্দেশে যে মোনাযারা করা হয়, তা আল্লাহ তাআলার কাছে নিন্দনীয় ও শয়তানের কাছে প্রশংসনীয় বদঅভ্যাসসমূহের উৎস হয়ে থাকে। অহংকার, হিংসা, আত্মম্ভরিতা, লোভ-লালসা, জাঁকজমকপ্রিয়তা ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ অনিষ্টের সম্পর্ক মোনাযারার সাথে এমন, যেমন যেনা, গালি-গালাজ, হত্যা, চুরি ইত্যাদি বাহ্যিক অনিষ্টের সম্পর্ক মদ্যপানের সাথে। কোন ব্যক্তিকে মদ্যপান এবং এসব কুকর্ম করার ক্ষমতা দেয়া হলে যেমন সে মদ্যপানকে সামান্য মনে করে তা করে বসবে, এরপর মাতাল অবস্থায় অবশিষ্ট কুকর্মগুলো করে ফেলবে, তেমনি যার মনে অপরকে নিশ্চুপ করার আগ্রহ, মোনাযারায় জয়ী হওয়ার বাসনা এবং জাঁকজমক ও অহংকারপ্রীতি প্রবল থাকে, তার মনে সকল প্রকার লুকিয়ে থাকে এবং যাবতীয় বদভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হাদীস ও কোরআনের আলোকে আমরা এসব বদভ্যাসের নিন্দা তৃতীয় খন্ডে বর্ণনা করব। এখানে কেবল এমন কতিপয় বদভ্যাস বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলো মোনাযারা থেকে উদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিংসা। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب۔

"হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে হিংসা থেকে মুক্ত হয় না। কারণ, সে কখনও জয়ী হয় এবং কখনও পরাভূত হয়। কখনও তার যুক্তির প্রশংসা করা হয় আবার কখনও প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রশংসিত হয়। যে পর্যন্ত পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও এমন থাকবে, যে জ্ঞান গরিমা ও মোনাযারায় স্বনামখ্যাত অথবা মোনাযারাকারীর ধারণায় তার যুক্তিই অধিক শক্তিশালী, সে পর্যন্ত অবশ্যই সে হিংসা পোষণ করবে, প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ফিরে কেবল মোনাযারাকারীর দিকে আকৃষ্ট হোক এমনটা পছন্দ করবে। সত্য বলতে কি, হিংসা একটি জ্বলন্ত আগুন। যে এতে লিপ্ত হয়, সে দুনিয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে কালাতিপাত করে। আখেরাতের আযাব আরও বেশী ভয়ংকর। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান যেখানেই পাও, অর্জন কর। ফেকাহবিদদের যেসকল উক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে, সেগুলো গ্রহণ করো না। তারা পালের ছাগলের ন্যায় লড়াই করে।

দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে অহংকার করা। এ সম্পর্কে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ "যেব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করেন। আর যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উঁচু করেন।"

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

العظمة ازاری والكبرياء ردائی فمن نازعنی واحدا فيهما قصمته۔

"মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং বড়ত্ব আমার চাদর। যেব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে আমার সমকক্ষতার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেই।"

মোনাযারাকারীরা তাদের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের লোকদের সাথে অহংকার, বড়ত্ব অন্বেষণ এবং আপন যোগ্যতার চেয়ে বড় আসন লাভের বাসনা থেকে মুক্ত থাকে না। এমনকি, সভাপতির আসনের

নিকটে অথবা দূরের জায়গায় বসার জন্যে পর্যন্ত লড়াই করে এবং পথ সংকীর্ণ হলে আগে যাওয়ার জন্যে খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। মাঝে মাঝে তাদের কতক অনভিজ্ঞ ও প্রতারক ব্যক্তি বলে থাকে, এলেমের ইযযত রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য। ঈমানদার ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এই বাহানায় তারা বিনয়কে লাঞ্ছনা বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ তাআলা ও পয়গম্বরগণ বিনয়ের প্রশংসা করেছেন। যে অহংকার আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিন্দনীয়, তারা তাকে ধর্মের সম্মানরূপে আখ্যায়িত করে এবং শব্দ পরিবর্তন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এটা এলেম ও হেকমত শব্দকে পরিবর্তন করে অন্য অর্থ করারই মত।

আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। খুব কম মোনাযারাকারীই এ দোষ থেকে মুক্ত থাকে। অথচ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ "ঈমানদার ব্যক্তি পরশ্রীকাতর হতে পারে না।" এর নিন্দায় অনেক কিছু বর্ণিত আছে। মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন কাউকে দেখে যে, সে প্রতিপক্ষের কথায় মাথা নাড়ে এবং তার কথা ভালরূপে শুনে না, তখন সে উদ্বিগ্ন হয় এবং তার প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে।

আর একটি কুঅভ্যাস হচ্ছে গীবত তথা পরনিন্দা। আল্লাহ তাআলা একে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। মোনাযারাকারী ব্যক্তি এরূপ মাংস ভক্ষণেই অভ্যস্ত হয়ে থাকে। সে সর্বদা প্রতিপক্ষের কথাবার্তা উদ্ধৃত করে তার নিন্দা করে। সে চরম সাবধানী হলে এটা করে যে, প্রতিপক্ষের কথা সত্য সত্য বর্ণনা করে– মিথ্য বলে না, কিন্তু এতেও এমন কথা বর্ণনা করে না, যদ্দারা তার দোষ, হেরে যাওয়া এবং মানহানি ঘটতে পারে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের আলোচনা গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মিথ্যা বলে, তবে সেটা তো পুরোই অপবাদ, যা গীবত থেকেও জঘন্য।

অপর একটি বদভ্যাস হচ্ছে আত্মপ্রশংসা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -

তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে মোত্তাকী সেটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ মন্দ সত্য কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আত্মপ্রশংসা করা। যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে শক্তি-সামর্থ্য

ও সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্বে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে নিজের প্রশংসা নিজেই করে থাকে। বরং মোনাযারার মাঝখানে বলে উঠে– এ ধরনের বিষয় আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। এগুলো আমার নখদর্পণে। আমি হাদীস ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী। সে এমনি ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা কখনও আস্ফালনের ছলে এবং কখনও নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশে বলে থাকে। বলাবাহুল্য, আস্ফালন এবং দর্প প্রদর্শন করা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

ছিদ্রান্বেষণও মোনাযারা থেকে উদ্ভূত একটি কুঅভ্যাস। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوا তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না। মোনাযারাকারী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দোষ অন্বেষণ করে ফিরে। এমনকি, তার শহরে কোন মোনাযারাকারীর আগমনের সংবাদ পেলে সে এমন ব্যক্তির খোঁজ করে, যে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে দিতে পারে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে করে দোষ জেনে নেয় এবং প্রয়োজনে সেগুলো প্রকাশ করে প্রতিপক্ষকে লজ্জা দেয়। এমনকি, তার শৈশবকালীন অবস্থা এবং দৈহিক দোষ যেমন টেকো হওয়া ইত্যাদিও জেনে নেয়। এর পর মোনাযারার সময় তাকে সামান্যও প্রবল হতে দেখলে প্রথমে সম্ভ্রমের খাতিরে ইশারা ইঙ্গিতে সেসব দোষ বর্ণনা করে। অন্যরাও এ বিষয়টি পছন্দ করে এবং স্বয়ং মোনাযারাকারী এক একটি সূক্ষ্ম অস্ত্ররূপে গণ্য করে। পক্ষান্তরে দুর্মুখ হলে প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় সেসব দোষ উল্লেখ করতে দ্বিধা করে না।

অপরের দুঃখে আনন্দিত হওয়া এবং আনন্দে দুঃখ করাও একটি বদ অভ্যাস, যা মোনাযারাকারীর মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ যে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে না, সে ঈমানদারদের চরিত্র থেকে বহু মনযিল দূরে অবস্থান করে। অতএব যেব্যক্তি গুণগরিমা প্রকাশ করে গর্ব করে, তার কাছে অবশ্যই তা ভাল লাগবে, যা তার সমকক্ষ ও গুণগরিমায় অংশীদারদের কাছে খারাপ লাগে। তাদের মধ্যে এমন শত্রুতা হবে, যেমন সতীনদের মধ্যে হয়ে থাকে। এক সতীন দূর থেকে অপর সতীনকে দেখে যেমন ক্ষেপে উঠে এবং মলিন হয়ে যায়, তেমনি মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন অপরকে দেখে, তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা এসে যায়; যেন

সামনে ভূত এসে গেছে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে সে মহব্বত ও মুখ কোথায়, যা খাঁটি আলেমগণের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় হয়ে থাকে? যেরূপ ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সুখে দুঃখে শরীক থাকার কথা আলেমগণ থেকে বর্ণিত আছে, তা তাদের মধ্যে কোথায়? এমনকি, শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এখন আমরা জানি না, যাদের মধ্যে এলেম ও শিক্ষা একটি চূড়ান্ত শত্রুতার কারণ হয়ে গেছে, তারা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মযহাব অনুসরণের দাবী করে কিরূপে? এটা কিরূপে সম্ভব, গর্ব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মহব্বত ও সম্প্রীতি কায়েম থাকবে? এটা কখনও হতে পারে না। এ মোনাযারা যে মন্দ, তা জানার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, মোনাযারা তোমার কাছ থেকে মুমিনদের অভ্যাস ছাড়িয়ে নিয়ে মোনাফিকদের অভ্যাসের সাথে তোমাকে জড়িয়ে দেয়।

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে নেফাক তথা কপটতা। এর অনিষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ নয়। যারা মোনাযারা করে, তাদের কপটতাও করতে হয়। উদাহরণতঃ প্রতিপক্ষ অথবা তার বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত হলে অপারগ হয়ে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা হয়, তাদের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করা হয় এবং তাদের মর্তবায় বিশ্বাস প্রকট করা হয়। অথচ বক্তা নিজে ও সম্বোধিত ব্যক্তি এবং অন্য যারা শুনে, সকলেই জানে, এ সব বানোয়াট, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুষ্কর্ম বৈ কিছু নয়। বাহ্যতঃ মুখে বন্ধু হলেও আন্তরিকভাবে একে অপরের শত্রু। আল্লাহ তাআলা এহেন বদভ্যাস থেকে আপন আশ্রয়ে রাখুন।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন মানুষ এলেম শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয় এবং মুখে বন্ধু হয়ে থাকে, কিন্তু অন্তরে পরস্পরের শত্রু হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন, তাদেরকে বধির করে দেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করেন। অভিজ্ঞতার আলোকেও অবশ্যই এমনটি হতে দেখা গেছে।

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে সত্য কথার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও সে সম্পর্কে লড়াই করার স্পৃহা। মোনাযারাকারীদের কাছে সর্বাধিক মন্দ

বিষয় হচ্ছে প্রতিপক্ষের মুখ থেকে সত্য প্রকাশ পাওয়া। এরূপ হলে মোনাযারাকারী তা অস্বীকার করা ও না মানার জন্যে সাধ্যানুযায়ী উঠে পড়ে লেগে যায় এবং যতদূর সম্ভব তা প্রতিহত করার জন্যে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ফলে সত্য বিষয়ে লড়াই করা তার মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়। যখনই কোন কথা কানে পড়ে, তখনই তাতে আপত্তি তোলার কথা ভাবতে থাকে। ক্রমশঃ এ বিষয়টি কোরআন পাকের দলীলসমূহে এবং শরীয়তের ভাষায়ও তার মনে প্রবল হয়ে যায়। সে এক দলীলের মোকাবিলা অন্য দলীল দ্বারা করে। অথচ বাতিলের মোকাবিলায়ও লড়াই ঝগড়া করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا فى اعلى الجنة ـ

যেব্যক্তি বাতিলপন্থী হয়ে ঝগড়া বর্জন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতের এক কোণে গৃহ নির্মাণ করেন। আর যেব্যক্তি সত্যপন্থী হয়ে কলহ বর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁর নিজের উপর মিথ্যা বলা এবং সত্য বিষয় মিথ্য প্রতিপন্ন করাকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। সেমতে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ـ

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা গড়ে এবং সত্য বিষয়কে তার কাছে আসার পর মিথ্যা বলে জাহির করে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ـ

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণ দেয় এবং সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা বলে?

আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব। এটা অধিক দুরারোগ্য ব্যাধি। এর দ্বারা সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

বর্ণিত দশটি আভ্যন্তরীণ দোষই সকল অনিষ্টের মূল। সম্ভ্রমশীল নয়– এমন লোকদের মধ্যেযেসব অনিষ্ট হয়ে যায়,সেগুলো এর অতিরিক্ত। উদাহরণতঃ এমনভাবে বিতর্ক করা যে, হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, কিলঘুষি, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, পিতামাতাকে ও ওস্তাদদেরকে মন্দ বলা এবং গালিগালাজ করার উপক্রম হয়ে যায়। এ ধরনের লোক মনুষ্যত্বের গণ্ডির বাইরে। যারা বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রমশীল, তাদের মধ্যে এ দশটি অনিষ্ট অবশ্যই থাকে। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে কোন মোনাযারাকারী এগুলোর মধ্যে কতক বদভ্যাস থেকে বেঁচেও থাকে, যদি তার প্রতিপক্ষ তার চেয়ে নিম্নস্তরের হয় অথবা অনেক বেশী উঁচু স্তরের হয়, অথবা তার শহর থেকে দূরে বসবাস করে। আর যার প্রতিপক্ষ সমকক্ষ, নিকটে বসবাসকারী ও সমস্তরের হয়, সে এই দশটি বদভ্যাস থেকে মুক্ত হয় না। এ দশটি বদভ্যাস থেকে আরও দশটি কুকাণ্ড প্রকাশ পায়, যার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ দীর্ঘ মনে করে আমরা এখানে উল্লেখ করছি না। উদাহরণতঃ নাক সিঁট্কানো, রুষ্টতা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, জাঁকজমক, আস্ফালন, ধনী ও সরকারী কর্মচারীদের সম্মান এবং তাদের কাছে আসা-যাওয়া, তাদের হারাম ধন সম্পদ গ্রহণ, নিষিদ্ধ পোশাকে সজ্জিত হওয়া, গর্ব অহংকারভরে অপরকে হেয় মনে করা, বেশী কথা বলা, মন থেকে ভয় ও আশা তিরোহিত হওয়া, এমন গাফেল হওয়া যে, নামাযে দাঁড়িয়ে কত রাকআত পড়েছে এবং কি পড়েছে তা মনে না থাকা, কার কাছে মোনাজাত করছে, তাও বোধশক্তিতে না থাকা। মোনাযারাকারী ব্যক্তি সারাজীবন মোনাযারা সম্পর্কিত এলেমের মধ্যে ডুবে থাকে এবং উত্তম বাক্য বলা, ছন্দপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা, বিরল কথাবার্তা স্মরণ করা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকে। অথচ এগুলো আখেরাতে কোন উপকারে আসবে না। মোনাযারাকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাদের মধ্যে যেব্যক্তি অধিক ধার্মিক ও জ্ঞানী, তার মধ্যেও এসব বদভ্যাসের উপকরণ সঞ্চিত থাকে। সে মোজাহাদার মাধ্যমে একে গোপন রাখে। এই খারাপ অভ্যাসগুলো সে ব্যক্তির মধ্যেও বিদ্যমান থকে, যে ওয়াজ নসীহতে মশগুল থাকে, যদি ওয়াজ দ্বারা তার উদ্দেশ্য জনপ্রিয়তা অর্জন এবং ধন-দৌলত ও সম্মান অর্জন করা হয়।

যদি কোন ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভ, ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হওয়া এবং সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার উদ্দেশে এলেম, মযহাব ও ফতোয়ায় নিয়োজিত থাকে, তবে তার মধ্যে এসব অভ্যাস অপরিহার্যরূপে পাওয়া যাবে। মোট কথা, যেব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব ছাড়া অন্য কিছুর উদ্দেশে আলেম হবে, তার মধ্যেই এ সমস্ত বদভ্যাস পাওয়া যাবে। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতে মানুষের মধ্যে কঠোরতর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ্ তাআলা তার এলেম দ্বারা কোন উপকার পৌছাননি। এক্ষেত্রে তার এলেম উপকার না করে বরং ক্ষতি করেছে। যে এলেম অন্বেষণ করে তার অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে দুনিয়াতে রাজত্ব অন্বেষণ করে। যদি ঘটনাক্রমে রাজত্ব না পায় তবে আশা করা যায় না যে, সে অন্য লোকদের মত বেঁচে থাকবে; বরং তাকে অবশ্যই বড় বড় লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে। যদি বল, মোনাযারার অনুমতি দেয়ার মধ্যে উপকারিতা রয়েছে, এতে এলেম অন্বেষণের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা না থাকলে এলেম মিটে যাবে। তবে আমি বলব, তোমার এ কথা এক দিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু উপকারী নয়। কারণ ছেলেদেরকে খেলার বল, ডাংগুলি ও খেলাধুলার প্রতিশ্রুতি না দিলে তারা মক্তবের প্রতি আগ্রহী হয় না। এতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়া উত্তম হয়ে যায় না। এমনিভাবে জাঁকজমকপ্রীতি না হলে এলেম মিটে যাবে– এ বাক্য এ কথা বুঝায় না যে, যেব্যক্তি জাঁকজমক অন্বেষণ করবে, সে মুক্তি পাবে। বরং সে তো তাদেরই একজন যাদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله ليؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم -

"আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকের মাধ্যমেও এ দ্বীনকে শক্তিশালী করেন, যাদের দ্বীনে কোন অংশ নেই।"

অন্যত্র বলেন ঃ

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر -

"আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ দ্বীনকে শক্তি দান করেন।"

এ থেকে জানা গেল, যারা জাঁকজম প্রিয়, তারা নিজেরা তো ধ্বংস

হয় বটে, কিন্তু কখনো কোন সময় তাদের দ্বারা অন্যদের মঙ্গল হয়, যদি তারা অন্যদেরকে সংসার বর্জনের আহ্বান জানায়। এটা এরূপ নেতাদের মধ্যে হয়, যাদের অবস্থা বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী মনীষীগণের বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ হয়; কিন্তু অন্তরে জাঁকজমকপ্রিয়তা লুক্কায়িত থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত মোমবাতির মত। সে নিজে জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু অন্যেরা তার কাছ থেকে আলো লাভ করে। অর্থাৎ, এই নেতাদের ধ্বংসের মাধ্যমে অন্যদের মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু যদি কোন নেতা সংসার অন্বেষণে উৎসাহ দেয়, তবে তাকে জ্বলন্ত অগ্নি মনে করতে হবে, সে নিজে প্রজ্বলিত এবং অপরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

মোট কথা, আলেমগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) যারা নিজেরাও ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। তারা এমন আলেম, যারা প্রকাশ্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে এবং দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। (২) যারা নিজেরাও ভাগ্যবান এবং অপরকেও ভাগ্যবান করে। তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে যাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহ্বান করে। (৩) যারা নিজেরা ধ্বংস হবে; কিন্তু অপরকে ভাগ্যবান করে। তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে আখেরাতের দিকে আহ্বান করে এবং বাহ্যতঃ নিজেরাও সংসার নির্লিপ্ত; কিন্তু তাদের অন্তরে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাঁকজমকের বাসনা লুক্কায়িত থাকে। এখন তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর, কোন্ শ্রেণীতে রয়েছ এবং কিসের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছ– দুনিয়ার না আখেরাতের? এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি নয়, আল্লাহ্ তাকে কবুল করবেন। ইনশাআল্লাহ্ আমরা রিয়া অধ্যায়ে বরং গোটা তৃতীয় খণ্ডে এমন আলোচনা করব, যাতে তুমি নিঃসন্দেহ হয়ে যাবে।
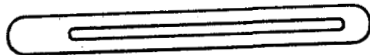
পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আদব

শিক্ষার্থীর আদব অনেক হলেও সেগুলো মোটামুটি দশ ভাগে বিভক্ত। প্রথম আদব, শিক্ষার্থী নিজেকে হীন চরিত্র ও মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র রাখবে। কেননা, শিক্ষা হচ্ছে অন্তরের এবাদত, আভ্যন্তরীণ সংশোধন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়। বাহ্যিক এবাদত নামায যেমন বাহ্যিক নাপাকী থেকে বাহ্যিক পবিত্রতা ছাড়া দুরস্ত হয় না, তেমনি আভ্যন্তরীণ এবাদত অর্থাৎ, এলেম দ্বারা অন্তরের এবাদতও মন্দ চরিত্র এবং নাপাক অভ্যাস থেকে পাক হওয়া ছাড়া দুরস্ত হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ بنى الدين على النظافة অর্থাৎ, ধর্ম-কর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ -

অর্থাৎ, মুশরিকরা নাপাক। এতে বুদ্ধিমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই নির্ভরশীল নয়, যা চোখে পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ মুশরিকরা গোসলও করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়ও পরিধান করে, অথচ তাদের অভ্যন্তরভাগ নাপাক থাকে। নাপাকী এমন বিষয়কে বলে, যা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। আভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকে বেঁচে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ নাপাকী পরিণামের দিক দিয়ে মারাত্মক। এ জন্যেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ لايدخل الملائكة بيتا فيه كلب -

"যে গৃহে কুকুর রয়েছে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"

অন্তর মানুষের একটি গৃহ, যাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত, প্রভাব ও অবস্থান হয়ে থাকে। ক্রোধ, কামনা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষ্যাপা কুকুর সদৃশ। অতএব অন্তরে যদি এসব কুকুর থাকে, তবে তাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত কিরূপে হবে।। শিক্ষার নূরও আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অন্তরে পৌছান। সেমতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهِ مَا يَشَاءُ -

অর্থাৎ কোন মানুষের যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে পাঠিয়ে দেন তিনি কোন পয়গামবাহক; সে তাঁর আদেশে যা ইচ্ছা পৌঁছে দেয়।

অনুরূপভাবে জ্ঞান সংক্রান্ত রহমতের দায়িত্বেও ফেরেশতাগণ নিয়োজিত। তারা নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পাক পবিত্র। সুতরাং তারা পাক জায়গাই দেখে এবং তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার পবিত্র অন্তরেই ভরে দেয়। আমরা একথা বলি না যে, উল্লিখিত হাদীসে গৃহের অর্থ অন্তর এবং কুকুরের অর্থ ক্রোধ ও নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ বোঝানো হয়েছে। এরূপ বললে বাতেনিয়া সম্প্রদায় আপত্তি করবে, তোমরা আমাদেরকে যা করতে নিষেধ কর, এখন নিজেরাই তা করছ। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ হাদীসে এ বিষয়টির প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বাহ্যিক শব্দ পরিবর্তন করে আভ্যন্তরীণ অর্থ গ্রহণ এক কথা এবং বাহ্যিক অর্থ বহাল রেখে আভ্যন্তরীণ অর্থের প্রতি হুশিয়ারী অবলম্বন ভিন্ন কথা। দ্বিতীয়টি জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি। আলেম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের এটাই নিয়ম। কেননা, জ্ঞানার্জনের অর্থ হল, যে বিষয় অন্যদেরকে বলা হয় তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত না রাখা; বরং নিজেও তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যের উপর বিপদ দেখে, তবে সে একে নিজের জন্যে শিক্ষা মনে করে এবং সেও বিপদের লক্ষ্য হতে পারে বলে বুঝে নেয়। কারণ, দুনিয়াতে পরিবর্তন হতেই থাকে। সুতরাং অন্যের অবস্থা দেখে নিজের দিকে খেয়াল করা এবং দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা করা একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা।

অনুরূপভাবে মানব নির্মিত গৃহ থেকে তুমিও অন্তরের দিকে খেয়াল কর, যা আল্লাহ তাআলার একটি গৃহ বিশেষ। কুকুর তার মন্দ অভ্যাস অর্থাৎ, হিংস্রতা ও অপবিত্রতার কারণে নিন্দনীয়– আকার আকৃতির কারণে নয়। তুমি কুকুর থেকে তার হিংস্রতার ধ্যান কর এবং জেনে নাও, যে অন্তর ক্রোধ, লোভ-লালসা, দুনিয়ার জন্যে কলহ-বিবাদ এবং ধন-সম্পদের জন্যে মানুষকে অপমান করা ইত্যাদি কুঅভ্যাসে পরিপূর্ণ, সে অন্তর আভ্যন্তরীণ কুকুর এবং বাহ্যিক অন্তর। জ্ঞানের নূর অভ্যন্তরভাগ দেখে, বাইরের অঙ্গ নয়।

সুতরাং যদি কেউ বলে, অনেক লোক কুচরিত্রের অধিকারী হয়েও জ্ঞান অর্জন করেছে, তবে এর জওয়াব, এটা কখনও হতে পারে না। যেব্যক্তি কুচরিত্রের অধিকারী, সে আখেরাতে উপকারী ও চিরন্তন সৌভাগ্যের কারণ সত্যিকার জ্ঞান কখনও অর্জন করতে পারবে না। সে এ জ্ঞান থেকে

অনেক মন্‌যিল দূরে থাকবে। কারণ, এ জ্ঞানের সূচনাতেই শিক্ষার্থী জানবে, গোনাহ মারাত্মক সর্বনাশা বিষ। তুমি কখনও কাউকে জেনেশুনে মারাত্মক বিষ সেবন করতে দেখেছ কি? তুমি যে জ্ঞানের কথা শুনেছ, সেটা মানুষের একটি প্রথাগত বিষয়। তারা এটা মুখে উচ্চারণ করে এবং কখনও অন্তরে বার বার বলে। সত্যিকার জ্ঞানের উপর এর কোন দখল নেই। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক বর্ণনা দ্বারা জ্ঞান হয় না; বরং জ্ঞান অন্তরে গুপ্ত একটি নূর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে কেবল আল্লাহর ভয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

অর্থাৎ, একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। এখানে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানের বিশেষ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এদিক দিয়েই জনৈক অনুসন্ধানবিদ এ বাক্যের অর্থ করেছেন–

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم ان يكون الا لله .

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উদ্দেশে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। কিন্তু জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এর মর্মার্থ, জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়নি এবং এর স্বরূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়নি। কেবল বাহ্যিক শব্দ ও বাক্য অর্জিত হয়েছে। যদি বল, আমরা অনেক অনুসন্ধানী আলেম ও ফেকাহ্‌বিদকে দেখি, তাঁরা শাখা ও মূলনীতিতে সেরা বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য হয়; অথচ তাদের চরিত্র খারাপ। তবে এর জওয়াব হচ্ছে, তুমি যখন জ্ঞানের স্তর ও আখেরাতের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হবে, তখন বুঝতে পারবে, যে জ্ঞানে তারা মশগুল রয়েছেন, সেটা জ্ঞান হিসাবে খুব কমই উপকারী। জ্ঞান কেবল আল্লাহর উদ্দেশে অর্জন করলেই এবং আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য হলেই এর উপকার পাওয়া যায়। এদিকে আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি এবং সত্বরই এ অধ্যায়ে আরও সবিস্তার বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় আদব, শিক্ষার্থী সাংসারিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্ক হ্রাস করবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকবে। কেননা সকল সম্পর্কই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও বাধাদানকারী। আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দু'টি মন সৃষ্টি করেননি। ফলে চিন্তা বিভক্ত থাকলে জ্ঞানের প্রকৃত

স্বরূপ উদঘাটনে ত্রুটি দেখা দেবে। এজন্যেই কেউ বলেছেন ঃ শিক্ষা তোমাকে তার সামান্য অংশও দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাতে সমস্ত মন প্রাণ নিবিষ্ট করবে। তুমি এরূপ করলে জ্ঞান তোমাকে যে সামান্য অংশ দেবে, তাও উপকারী কিনা জানা নেই। যে চিন্তা অনেক কাজে বিভক্ত থাকে, তা নালার পানির মত ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছু অংশ মাটি শুয়ে ফেলে এবং কিছু শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যায়। ফলে ক্ষেতে পৌঁছার মত পানি থাকে না।

তৃতীয় আদব, শিক্ষার্থী জ্ঞানের কারণে অহংকার করবে না এবং শিক্ষকের উপর শাসন চালাবে না; বরং নিজের ব্যাপার সর্বাবস্থায় পুরোপুরি শিক্ষকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে। তার উপদেশ তেমনি মান্য করবে, যেমন মূর্খ রোগী দয়ালু ও বিচক্ষণ ডাক্তারের কথা মান্য করে। শিক্ষাগুরুর সাথে বিনয়াবনত ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁর সেবা দ্বারা সওয়াব ও গৌরব কাম্য হওয়া দরকার। শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) জানাযার নামায পড়লে তাঁর খচ্চর তাঁর নিকটে আনা হয়, যেন তিনি তাতে সওয়ার হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আগমন করলেন এবং খচ্চরের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটি চেপে ধরলেন। যায়েদ ইবনে সাবেত বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই! আপনি লোহার আংটি ছেড়ে দিন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আলেম ও মহান ব্যক্তিদের সাথে এমনি ব্যবহার করার নির্দেশ আমি পেয়েছি। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁর হস্ত চুম্বন করে বললেন ঃ আমরাও আমাদের পয়গম্বরের পরিবার-পরিজনের সাথে এমনি ব্যবহার করার আদেশ পেয়েছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ খোশামোদ করা ঈমানদারের চরিত্র নয়; কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণে খোশামোদ করা যায়। সুতরাং শিক্ষার্থীর অহংকার করা উচিত নয়। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলেমের কাছেই পড়ব– অন্যের কাছে নয়– এটাও শিক্ষার্থীর এক প্রকার অহংকার। এটা নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। কেননা, জ্ঞান মুক্তি ও সৌভাগ্যের কারণ। যেব্যক্তি কোন ইতর হিংস্র জন্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে এ বিষয়ে পার্থক্য করবে না যে, তাকে আত্মরক্ষার কৌশল কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি না অজ্ঞাত ব্যক্তি বলে দেবে। বলাবাহুল্য, যারা আল্লাহ তা'আলাকে জানে না, তাদের জন্যে অগ্নিরূপী সর্বগ্রাসী শত্রুর ক্ষতি প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর ক্ষতির তুলনায় ভয়ংকর হবে। জ্ঞান ঈমানদারের

হারানো সম্পদ; যেখানে তা পাবে, সেখান থেকেই সৌভাগ্য মনে করে গ্রহণ করবে। কেউ এ জ্ঞান তার কাছে পৌঁছালে, সে যেই হোক তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে।

মোট কথা, বিনয়াবনত হওয়া ও কান লাগানো ছাড়া জ্ঞান অর্জিত হয় না।। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ـ

অর্থাৎ, "এতে সে ব্যক্তির চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে, যার অন্তর আছে অথবা যে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।"

অন্তর থাকার উদ্দেশ্য জ্ঞানের যোগ্যতা ও অনুধাবন করার প্রতিভা থাকা। অনুধাবনে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না মনোনিবেশ সহকারে শুনবে। যাতে কানে যা কিছু ফেলা হয়, তা ভালরূপে শুনে বিনয়, শোকর, আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা সহকারে কবুল করে নেয়। ওস্তাদের সামনে শাগরেদদের এমন থাকা উচিত, যেমন নরম মাটি, যার উপর অনেক বৃষ্টি পড়ে এবং মাটি সব পানি পান শুষে। ওস্তাদ কোন নিয়ম বললে শাগরেদ তার অনুসরণ করবে, নিজের মতামত খাটাবে না। কেননা, ওস্তাদ ভুল করলেও তা শাগরেদের নির্ভুলতা অপেক্ষা তার জন্যে অধিক উপকারী। অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন সূক্ষ্ম বিষয় জানা যায়, যা শুনলে অবাক লাগে। কিন্তু তার উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ অনেক গরম মেজাজের রোগীর চিকিৎসা চিকিৎসকরা গরম ওষুধ দ্বারাই করেন, যাতে রোগীর মধ্যে চিকিৎসার গুরুভার সহ্য করার মত উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নয়, তারা একথা শুনে আশ্চর্যবোধ করে। আল্লাহ তা'আলা হযরত খিযির ও মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। হযরত খিযির বললেন ঃ

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا ـ

অর্থাৎ "আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আপনি এমন বিষয় দেখে ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করেও যার তত্ত্ব আপনার আয়ত্বাধীন নয়?"

এরপর হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে শর্ত দিলেন, চুপ থাকতে হবে এবং আমি নিজে না জানানো পর্যন্ত প্রশ্ন করা চলবে না।

فَاِنِ اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْئَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ـ

"অতএব আপনি যদি আমার সাথে থাকেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে আপনাকে বলি।" কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) সবর করতে পারলেন না, বার বার তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলেন। অবশেষে এটাই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেল। সারকথা, যে শাগরেদ তার ওস্তাদের মোকাবিলায় নিজের মত ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখে, সে তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলেছেন ঃ

فَاسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ـ

অর্থাৎ "তোমাদের জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

এ থেকে জিজ্ঞেস করার অনুমতি জানা যায়। এর উদ্দেশ্য, বাস্তবে জিজ্ঞেস করা বৈধ। কিন্তু যেসব বিষয় জিজ্ঞেস করার অনুমতি ওস্তাদ দেন সেগুলোই জিজ্ঞেস করতে হবে। কেননা, যে কথা অনুধাবন করার ক্ষমতা তোমার নেই, তা জিজ্ঞেস করা খারাপ। এ কারণেই হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছিলেন।

মোট কথা, সময়ের পূর্বে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তোমার কি প্রয়োজন এবং তা কখন বলা উচিত, সে সম্পর্কে ওস্তাদ অবহিত রয়েছেন। যে পর্যন্ত বলার সময় না আসে, জিজ্ঞেস করার সময়ও আসে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আলেমের হক, তাকে অনেক প্রশ্ন করো না, জওয়াবের ব্যাপারে দোষারোপ করো না, যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন পীড়াপীড়ি করো না এবং সে ভুল করলে তাকে ক্ষমার্হ মনে কর। যে পর্যন্ত আলেম আল্লাহর আদেশের হেফাযত করে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা নিজের জন্য অপরিহার্য মনে কর। তার সামনে উপবেশন করো না।

চতুর্থ আদব, শিক্ষার্থী প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের মতভেদ শোনা থেকে বেঁচে থাকবে- সে দুনিয়ার জ্ঞান অন্বেষণ করুক অথবা আখেরাতের জ্ঞান। কেননা, মতভেদ শুনলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জ্ঞান-বুদ্ধি বিহ্বল, চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত ও মতামত শিথিল হয়ে পড়ে এবং উপলব্ধি ও

সূচনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে যায়। প্রথমে সে ওস্তাদের পছন্দনীয় কোন পন্থা বিশ্বাস করবে, এরপর অন্যান্য মাযহাব ও তাদের সন্দেহ শুনবে। যদি তার ওস্তাদ এক মত অবলম্বন করার ব্যাপারে পাকাপোক্ত না হয় এবং এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাব পাল্টানো ও তাঁদের উক্তি বর্ণনা করাই তাঁর অভ্যাস হয়, তবে এরূপ ওস্তাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এরূপ ওস্তাদ হেদায়াত করে কম এবং পথভ্রষ্ট করে বেশী। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? যে নিজেই হারিয়ে গেছে, সে অন্যকে পথ দেখাবে কেমন করে?

প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে সন্দেহের পেছনে পড়তে বারণ করা, কোন নও মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করারই মত। আর যে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, তাকে মতভেদসমূহে উৎসাহিত করা এমন, যেমন শক্ত ঈমানদারকে কাফেরদের সাথে দেখা সাক্ষাতে উৎসাহিত করা হয়। কেননা, প্রত্যেক কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক দরকার। এ জন্যেই ভীরু কাপুরুষকে কাফেরদের উপর হামলা করতে বলা হয় না; বরং বীরপুরুষকে এ কাজের জন্য ডাকা হয়। এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে কোন কোন দুর্বল লোক ধারণা করে যে, শক্ত লোকদের তরফ থেকে বর্ণিত শৈথিল্যে তাদের অনুসরণ করা জায়েয। তাঁরা বুঝেনি যে, শক্ত লোকদের কাজ কারবার দুর্বল লোকদের কাজ কারবার থেকে আলাদা। এ সম্পর্কে জনৈক শায়খ বলেন ঃ যেব্যক্তি আমাকে প্রথম অবস্থায় দেখেছে, সে যিন্দীক তথা খোদাদ্রোহী হয়ে গেছে। কারণ, শেষ অবস্থায় আমল বাতেনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ ফরয ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অন্যান্য আন্দোলন থেকে স্তব্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা মনে করে, এটা শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতা। অথচ বাস্তবে তা নয়; বরং এটা অন্তরের পর্যবেক্ষণের আওতায় সার্বক্ষণিক যিকিরে ব্যাপৃত থাকা, যা সর্বোত্তম আমল। দুর্বল ব্যক্তি অঙ্গের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটাকে পদস্খলন মনে করে এবং নিজেও তদ্রূপ করে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি এক গ্লাস পানিতে সামান্য নাপাক বস্তু ফেলে দেয় এবং বলে, সমুদ্রের জন্যে যা বৈধ তা গ্লাসের জন্যে আরও উত্তমরূপে বৈধ হওয়া উচিত। লোকটি জানে না যে, সমুদ্র তার শক্তির মাধ্যমে নাপাকীকে পানিতে পরিণত করে ফেলে এবং সমুদ্র প্রবল হওয়ার কারণে নাপাকীও সমুদ্রের মত হয়ে যায়। কিন্তু সামান্য নাপাকীই গ্লাসে প্রবল থাকে। সেটা গ্লাসকে নিজের মত নাপাক

করে দেয়। এমনি ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে এমন বিষয় জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে, যা অন্যের জন্যে জায়েয নয়। উদাহরণতঃ তাঁর জন্যে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে। কেননা, তাঁকে যে শক্তি দান করা হয়েছিল, তার সাহায্যে তিনি স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' তথা সমতা বিধান করতে পারতেন– তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন। অন্য ব্যক্তি অল্প কয়েকজনের মধ্যেও ন্যায়বিচার করতে পারে না। বরং তাদের মধ্যকার ক্ষতি স্বয়ং তাকেও গ্রাস করবে; অর্থাৎ স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে বসবে। যেব্যক্তি ফেরেশতাকে কর্মকারের অনুরূপ মনে করে, সে সফলকাম হবে কি?

পঞ্চম আদব, শিক্ষার্থী কোন উৎকৃষ্ট শাস্ত্রই না দেখে পরিত্যাগ করবে না। এতটুকু দেখবে যাতে তার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এর পর যদি জীবনে কুলায়, তবে সে সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করবে। নতুবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করে তাতে পূর্ণতা অর্জন করবে এবং অবশিষ্ট শাস্ত্রগুলো অল্প বিস্তর অর্জন করবে। কেননা, শাস্ত্র একে অপরের সহায়ক ও পরস্পর জড়িত। কোন শাস্ত্র শিক্ষা না করা শত্রুতাবশতই হতে পারে। কেননা, মানুষ যা করতে পারে না তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ -

অর্থাৎ, যখন তাঁর হেদায়েতে তারা পথে আসে না, তখন বলবে– এটা একটা সনাতন মিথ্যা।

জনৈক কবি বলেন, রোগের কারণে যার মুখের স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়, সে মিঠা পানিকেও তিক্ত মনে করে। মোটকথা, উৎকৃষ্ট শাস্ত্র স্তর অনুযায়ী বান্দাকে আল্লাহর পথের, পথিক করে দেয় অথবা পথ চলায় কিছু না কিছু সাহায্য করে।

ষষ্ঠ আদব, শিক্ষণীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি সহসা অবলম্বন করবে না; বরং ক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখবে। যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি থেকে শুরু করবে। কারণ, জীবন প্রায়শঃ সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই সাবধানতা হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তু থেকে উৎকৃষ্টটি অর্জন করবে এবং তা থেকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। অল্প জ্ঞান দ্বারা যে শক্তি অর্জিত হয়, তা সর্বোত্তম শিক্ষা তথা আখেরাত

বিষয়ক শিক্ষার উভয় প্রকার মোআমালা ও মোকাশাফায় ব্যয় করবে। এলমে মোআমালার অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে এলমে মোকাশাফা এবং এর পরিণতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মারেফাত। এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের উদ্দেশ্য সে বিশ্বাস নয়, যা জনসাধারণ বাপ-দাদার কাছ থেকে শুনে এসেছে অথবা মুখস্থ করে নিয়েছে। কালাম শাস্ত্রের পদ্ধতিও উদ্দেশ্য নয়, যাতে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কথা টিকিয়ে রাখা হয়। কালাম শাস্ত্রীদের উদ্দেশ্য এতটুকুই। বরং এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের উদ্দেশ্য হল এক প্রকার প্রত্যয়, যা সেই নূরের ফল, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে স্থাপন করে দেন, যখন বান্দা সাধনা করে তার অন্তরকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। অবশেষে বান্দা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যার সাক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) এভাবে দিয়েছেন– যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে আবু বকরের ঈমানই ভারী হবে। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু লোক শরীয়তের প্রবর্তক রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি শ্রবণ করার পর এর অনুরূপ যা কিছু শুনে, তাকে ঘৃণা করে এবং বলে যে, এগুলো সূফীদের অনর্থক ও দুর্বোধ্য কথাবার্তা।

সারকথা, তোমার সেই রহস্য জানার লোভ করা উচিত যা ফেকাহ্‌বিদ এবং কালামশাস্ত্রীদের সাহস ও আয়ত্তের বাইরে। এর অন্বেষণে লোভী না হয়ে তুমি এর পথ পাবে না।

মোট কথা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবকিছুর মূল লক্ষ্য যে শাস্ত্র, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফাত। এটা অতল সাগর। এতে সর্বাগ্রে রয়েছেন পয়গম্বরগণ, এর পর তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দু'জন দার্শনিকের চিত্র এক উপাসনালয়ে পরিদৃষ্ট হয়। তাদের একজনের হাতে রাখা একটি চিরকুটে লেখা ছিল ঃ যদি তুমি সকল বিষয় সংশোধন করে নাও, তবে মনে করো না যে, একটি বিষয়ও সংশোধন করতে পেরেছ, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ কর এবং তাঁকেই সকল কারণের মূল কারণ ও স্রষ্টা না জান। অপর হাতে রাখা চিরকুটে লিখিত ছিল ঃ আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের পূর্বে আমি পানি পান করতাম এবং পিপাসার্ত থাকতাম। অবশেষে যখন তাঁর মারেফাত অর্জিত হল তখন পানি পান করা ছাড়াই পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে গেল।

সপ্তম আদব, এমন কোন শাস্ত্রে পা রাখবে না, যে পর্যন্ত না তার আগে যেসব শাস্ত্র জানা দরকার সেগুলোর উপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয়। কেননা, শাস্ত্রসমূহ এক জরুরী ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত এবং এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের পথ। যে এই ক্রম ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সেই তওফীক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ـ

অর্থাৎ, "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথার্থই পাঠ করে।" অর্থাৎ, এলেম ও আমলের দিক দিয়ে এক শাস্ত্রে পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য শাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হয় না। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে তাতে তার উপরের শাস্ত্রে উন্নতি করার নিয়ত রাখবে। যদি কোন শাস্ত্রে মতভেদ হয় অথবা তাতে কয়েকজনই ভুল করে অথবা এলেম অনুসারে আমল না করে, তবে সে শাস্ত্র অর্থহীন বলে আখ্যায়িত করো না। যেমন কেউ কেউ চিকিৎসকের ভুল দেখে চিকিৎসা শাস্ত্রকে অকেজো মনে করে, জ্যোতিষীর কথাবার্তা ঘটনাচক্রে সত্য হতে দেখে কিছু লোক এর নির্ভুলতায় বিশ্বাসী হয় এবং কিছু লোক অন্য জ্যোতিষীর ভুল জেনে একে অকেজো বলে। অথচ তারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ বিষয়টির বাস্তবতা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে যাচাই করে নেয়া উচিত। কেউই কোন শাস্ত্রে এতটুকু ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয় না যে, তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে যাবে। এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে দেখে সত্য চেনার চেষ্টা করো না; বরং সত্যকে জেনে নাও। এরপর সত্যপন্থীদেরকে আপনা আপনি জেনে যাবে।

অষ্টম আদব, শাস্ত্রসমূহ যে কারণে একটি অপরটি থেকে শ্রেষ্ঠ, তা জানতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব দু'বিষয়ের কারণে হয়– ফলাফলের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এবং শক্তিশালী প্রমাণের কারণে। উদাহরণতঃ ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র দেখলে দেখা যায়, প্রথমটির ফলাফল অনন্ত জীবনের সুখ এবং দ্বিতীয়টির ফলাফল ধ্বংসশীল জীবনের সুখ। সুতরাং এদিক দিয়ে ধর্ম শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, তার ফলাফল শ্রেষ্ঠ। অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অংকশাস্ত্রের প্রমাণসমূহ পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী। সুতরাং এটা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। যদি অংকশাস্ত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে দেখি, তবে চিকিৎসাশাস্ত্র

অংকশাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশই আন্দাজ অনুমান মাত্র।

এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলের পরিচয় বিষয়ক শাস্ত্রই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। আর যেসব শাস্ত্র এ শাস্ত্র পর্যন্ত পৌছার উপায় ও মাধ্যম, সেগুলোও শ্রেষ্ঠ। কাজেই এ শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ ও লোভ করা তোমার উচিত নয়।

নবম আদব, শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে নিজের অভ্যন্তরকে সদগুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা এবং পরিণামে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং ফেরেশতা ও উর্ধ্ব জগতের নৈকট্যশীলদের প্রতিবেশিত্ব অর্জন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ, জাঁকজমক, নির্বোধদের সাথে বিতর্ক এবং সমকক্ষদের উপর গর্ব করা না হওয়া উচিত। জ্ঞানের দ্বারা যার নিয়ত থাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, তার পক্ষে অবশ্যই এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা দরকার, যা এই উদ্দেশের নিকটবর্তী। অর্থাৎ তার আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিতাব ও সুন্নতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফতোয়াশাস্ত্র, অভিধানশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র ইত্যাদিকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না। এগুলো ফরযে কেফায়া শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান। আমরা আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের প্রশংসায় যে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি, এতে মনে করো না যে, উপরোক্ত শাস্ত্রসমূহ মন্দ। যারা এসব শাস্ত্রে আলেম, তারা তাদের মতই, যারা মাটির হেফাযত করে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে। অর্থাৎ, তাদের কেউ যুদ্ধ করে, কেউ সাহায্য করে, কেউ তাদের পানি পান করায় এবং কেউ তাদের সওয়ারীর হেফাযত করে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে তুলে ধরা নিয়ত হলে তাদের কেউই সওয়াব থেকে বঞ্চিত নয়। আলেমগণের অবস্থাও তদ্রূপ। আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা আলেম, আল্লাহ তাদের মর্তবা উচ্চ করেন।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে তাদের অনেক মর্তবা।

মোট কথা, আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব আপেক্ষিক। কারও তুলনায় বেশী এবং কারও তুলনায় কম। তাঁরা স্বয়ং হেয় নয়। সুতরাং এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, যে এলেম উচ্চ মর্তবার নিম্নে, তা মূল্যহীন। বরং জানা উচিত যে, সর্বোচ্চ মর্তবা পয়গম্বরগণের, এর পর মজবুত আলেমগণের, এরপর সৎকর্মশীল বান্দাগণের– তাদের স্তর অনুযায়ী। সারকথা, যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে তার সওয়াব সে পাবে। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তার এলেম যাই হোক না কেন, তার জন্যে উপকারী হবে এবং তার মর্তবা অবশ্যই উচ্চ করবে।

দশম আদব, কোন্ শিক্ষা আসল উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী এবং কোন্‌টি দূরবর্তী, তা জানতে হবে; যাতে নিকটবর্তীকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং জরুরী জ্ঞান অবলম্বন করা যায়। জরুরী জ্ঞান অর্থ সে শিক্ষা যা তোমাকে চিন্তাশীল করবে। বলাবাহুল্য, দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র তোমার অবস্থাই তোমাকে চিন্তাশীল করে। দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আখেরাতের সুখ-শান্তি একত্রে অর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোরআন পাকে একথা বর্ণিত হয়েছে এবং অন্তর্দৃষ্টিও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই জ্ঞানই অনন্তকাল স্থায়ী হয়, সেটাই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় দুনিয়া হবে একটি মনযিল; দেহ হবে বাহন আর আমল হবে উদ্দেশের দিকে চলা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কেননা, সকল সুখ ও আনন্দ এতেই নিহিত। তবে পৃথিবীর কম লোকই এর মূল্য অনুধাবন করে।

জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ও দীদারের সাথে তুলনা করে দেখলে তা তিন প্রকার। দীদারের যা উদ্দেশ্য তা পয়গম্বরগণ অন্বেষণ করতেন এবং তাঁরাই এটা বুঝতেন। সে দীদার উদ্দেশ্য নয়, যা জনসাধারণ ও কালামশাস্ত্রীদের মস্তিষ্কে আসে। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুমি এলেমের এই প্রকারত্রয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

দৃষ্টান্ত এই– কোন গোলামকে বলা হল, যদি তুমি হজ্জ কর এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পূর্ণরূপে পালন কর, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে এবং রাজত্বও লাভ করবে। আর যদি তুমি হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হও এবং পথে কোন বাধার সম্মুখীন হও, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু রাজত্ব পাবে না। এখন এই গোলাম তিন প্রকার কাজের সম্মুখীন হবে– প্রথমতঃ সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা অর্থাৎ, উট ক্রয়, মশক তৈরী ও খাদ্য

শস্য সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ দেশ ত্যাগ করে কা'বা গৃহের দিকে রওয়ানা হওয়া এবং তৃতীয়তঃ হজ্জের ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং এক একটি রোকন ক্রমানুসারে আদায় করা। এই তিনটি অবস্থা এবং এহরাম ও বিদায়ী তওয়াফ শেষ হওয়ার পর গোলাম আযাদী ও রাজত্বের অধিকারী হবে। প্রত্যেক অবস্থায় এই গোলামের অনেক স্তর রয়েছে। এখন যেব্যক্তি এখনও পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত, অথবা চলা শুরু করেছে, সে সৌভাগ্যের এতটুকু কাছাকাছি হবে না, যতটুকু সেব্যক্তি হবে যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দিয়েছে। কেননা, সে দুই অবস্থা অতিক্রম করে খুব কাছে পৌছে গেছে। অনুরূপভাবে জ্ঞানও তিন প্রকার। এক প্রকার সফরের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করার মত। এটা হচ্ছে চিকিৎসা ও ফেকাহ শিক্ষা এবং দুনিয়াতে দেহের উপযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহ। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা প্রান্তরে চলা ও উপত্যকা অতিক্রম করার মত। এটা হচ্ছে বদভ্যাসের ময়লা থেকে বাতেনকে পাক-পবিত্র করা এবং এমন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছা, যেখানে তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারে না। এসব বিষয় পথ চলার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর জ্ঞান অর্জন করা পথের মনযিলসমূহ জানার মত। অতিক্রম না করে কেবল মনযিল ও পথ জেনে নেয়া যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি চরিত্র শুদ্ধ না করে কেবল চরিত্র শুদ্ধির উপায় জেনে নেয়াও যথেষ্ট নয়। জ্ঞান ছাড়া চরিত্র শুদ্ধি হতে পারে না। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হজ্জ ও হজ্জের রোকনসমূহের মত। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ফেরেশতার জ্ঞান এবং এলমে মোকাশাফায় বর্ণিত বিষয়াদির জ্ঞান। এ প্রকার শিক্ষার পর মুক্তি ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়। কিন্তু নিরাপত্তা এ পথের প্রত্যেক পথিকেরই অর্জিত হয় যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়। যারা আল্লাহ তা'আলার আরেফ, তাদের ছাড়া অন্য কেউ সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছতে পারে না। তারাই নৈকট্যশালী হয় এবং তাদের উপরই রহমত, সুখ ও জান্নাতের নেয়ামত বর্ষিত হয়। যারা পূর্ণতার স্তর থেকে দূরে থেকে যায়, তাদের নাজাত ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ -

অর্থাৎ, অতঃপর যদি সে নৈকট্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও জান্নাতের নেয়ামত। আর যদি সে হয় ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

আর যারা উদ্দেশের প্রতি মনোযোগী হয় না এবং সেদিকে চলে না, অথবা চললেও আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়তে চলে না; বরং জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে চলে, তারা বাম দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হবে। তাদের জন্যে বলা হয়েছে ঃ

نُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ -

অর্থাৎ, তারা উত্তপ্ত পানি দ্বারা আপ্যায়িত হবে এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

মোট কথা, এলমে মোকাশাফার পরে সৌভাগ্য তথা সিদ্ধি লাভ হয়। আর এলমে মোকাশাফা এলমে মোআমালার পরে আসে। অর্থাৎ আখেরাতের পথে চলা এবং গুণাবলীর উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করার পর এলমে মোকাশাফা অর্জিত হয়। আমরা চিকিৎসা ও ফেকাহশাস্ত্রকে হজ্জের জন্যে পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার সাথে তুলনা করেছি। এর কারণ, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্যে তাঁর দিকে অন্তর চলে, দেহ নয়। আমাদের মতে অন্তর সেই মাংসপিন্ড নয় যা চোখে উপলব্ধ হয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার এক রহস্য। এটা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয় না। কখনও একে রূহ এবং কখনও নফসে মুতমায়িন্নাহ বলা হয়। শরীয়ত একে কলব তথা অন্তর বলে ব্যক্ত করে। কেননা, অন্তর হচ্ছে এ রহস্যের প্রথম সওয়ারী এবং অন্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেহ তার সওয়ারী ও হাতিয়ারে পরিণত হয়। এলমে মোকাশাফা দ্বারা এ রহস্যের অবস্থা চমৎকাররূপে জানা যায়। এ রহস্য প্রকাশযোগ্য নয়; বরং এ সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি নেই। বেশীর বেশী এতটুকু বলার অনুমতি আছে যে, এটি একটি উৎকৃষ্ট বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং খোদায়ী নির্দেশ। সেমতে আল্লাহ্ বলেন—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ -

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার নির্দেশের অংশ।"

উদ্দেশ্য এই যে, রূহ তার পালনকর্তার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ তাআলাই এর উৎস এবং তাঁর দিকেই সে প্রত্যাবর্তন করে। দেহ এ রূহের সওয়ারী, যাতে সওয়ার হয়ে সে চলে। আল্লাহর পথে দেহ অন্তরের জন্যে এমন, যেমন হজ্জের পথে দেহের জন্যে উট অথবা পানির মশক। অতএব যে আমলের উদ্দেশ্য দেহের কল্যাণ সাধন, সেটা সওয়ারীর কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্যও দেহের কল্যাণ সাধন। কেননা, দৈহিক স্বাস্থ্যের দেখাশোনার জন্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ধরে নাও, মানুষ যদি একা থাকত, তবে তার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হত— ফেকাহ্র প্রয়োজন হত না। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একাকী অবস্থায় জীবিত থাকতে পারে না। আহারের জন্যে হালচাষ, বপন এবং অন্ন ও বাসস্থান অর্জন প্রভৃতি একাকী সমাধা করা সম্ভব হতে পারে না। এর জন্যে অন্যের সাথে মেলামেশা করা ও সাহায্য চাওয়া জরুরী। মানুষ যখন পরস্পরে মেলামেশা করেছে এবং কামনা বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন পরস্পরে কলহ-বিবাদ ও মারামারি করে বরবাদ হতে শুরু করেছে। এ কলহ বিবাদই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে, যেমন দেহের পিত্তাদি বিগড়ে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে পিত্তাদির দূষিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং শাসন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বাহ্যিক ফ্যাসাদ দূর করে কামনা বাসনায় সমতা আনয়ন করা। পিত্তাদিতে সমতা কায়েম রাখার নিয়ম কানুন জানাকে ফেকাহশাস্ত্র বলা হয়। উভয়টি দেহের হেফাযতের জন্যে অন্তরের বাহন হয়। সুতরাং যেব্যক্তি কেবল ফেকাহ্ ও চিকিৎসাশাস্ত্রেই নিয়োজিত থাকে এবং নফসের উপর মোজাহাদা বা সাধনা না করে, সে যেন উট ক্রয় করে তার প্রতিপালনেই কেবল ব্যস্ত থাকে; কিন্তু হজ্জের পথে পা বাড়ায় না। যারা আত্মার সংশোধন তথা এলমে মোকাশাফার পথে চলমান, তাদের সাথে এই ফেকাহ্শাস্ত্রীদের তুলনা এমন, যেমন যারা হজ্জের রোকনসমূহ পালনে লিপ্ত, তাদের সাথে সে ব্যক্তির তুলনা, যে উট কিনে সেটিকে কেবল ঘাস খাওয়াচ্ছে— হজ্জের পথে রওয়ানা হচ্ছে না।

সুতরাং এ বিষয়টি প্রথমেই চিন্তা কর এবং সে ব্যক্তির উপদেশ মান্য কর, যে তোমার কাছে এর কোন মজুরি চায় না এবং যে সততঃ এতে মগ্ন রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তোমার জন্যে এ বিষয়টি অর্জিত

হবে না। জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার জন্যে তোমাকে পূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর জন্যে এতটুকু আদবই যথেষ্ট মনে হয়।

শিক্ষকের আদব

জানা উচিত, জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের অবস্থা চার প্রকার, যেমন অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের চার অবস্থা হয়ে থাকে। প্রথম, মানুষ অর্থ সৃষ্টি করে। তখন তাকে উপার্জনকারী বলা হয়। দ্বিতীয়, আপন উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করে, তখন সে ধনী হয়ে যায় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে না। তৃতীয়, উপার্জিত অর্থ নিজের জন্যে ব্যয় করে, ফলে সে উপকৃত হয়। চতুর্থ, উপার্জিত অর্থ অন্যকে দেয়, তখন তাকে দাতা ও গুণী বলে গণ্য করা হয়। এই শেষ অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানেরও তদ্রূপ চারটি অবস্থা রয়েছে– এক, অর্জনের অবস্থা, দুই, অর্জিত জ্ঞানে এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যে, অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না থাকে, তিন, অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং চার, সে জ্ঞান দ্বারা অন্যের উপকার করা। শেষোক্ত অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, আমল করে এবং মানুষকে জ্ঞানদান করে– আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে তাকেই মহান বলা হয়। সে সূর্যের মত, অপরকে আলো দান করে এবং নিজেও আলোকময়। সে মেশকের মত, অপরকে সুগন্ধিতে আমোদিত করে এবং নিজেও সুগন্ধিযুক্ত। আর যেব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দান করে, কিন্তু নিজে আমল করে না, সে শাণের মত, লোহাকে ধারালো করে কিন্তু নিজে কাটে না, অথবা সূচের মত, যে অন্যের জন্যে পোশাক তৈরী করে, কিন্তু নিজে উলঙ্গ থাকে। মানুষ যখন শিক্ষাদানে মশগুল হয়, তখন সে একটি বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই এর আদব ও নিয়মাবলী স্মরণ রাখা উচিত। প্রথম শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদদেরকে সন্তানের মত স্নেহ করবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

انما انا لكم مثل الوالد لولد ـ

সন্তানের জন্যে যেমন পিতা, আমিও তোমাদের জন্যে তেমনি। অর্থাৎ, শিক্ষক শাগরেদদেরকে আখেরাতের আগুন থেকে বাঁচানোর নিয়ত করবেন। এটা পিতামাতার তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যেই শিক্ষকের হক পিতামাতার চেয়ে বেশী। কেননা, পিতামাতা সন্তানের ধ্বংসশীল জীবনের কারণ, আর শিক্ষক অক্ষয় জীবনের কারণ। শিক্ষক না থাকলে পিতামাতার কাছ থেকে অর্জিত বিষয় সন্তানকে স্থায়ী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিত, কিন্তু শিক্ষক বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকে বুঝব, যে আখেরাত শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। অথবা দুনিয়ার শাস্ত্র আখেরাতের নিয়তে শিক্ষা দেয়– দুনিয়ার নিয়তে নয়। কেননা, দুনিয়ার নিয়তে শিক্ষা দান করা মানে নিজে ধ্বংস হওয়া এবং অপরকে ধ্বংস করা। এমন শিক্ষকতা থেকে আল্লাহ হেফাযত করুন। এক পিতার পুত্ররা যেমন পারস্পরিক মহব্বত ও সম্প্রীতির সাথে থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সাহায্য করে, তেমনি এক ওস্তাদের শাগরেদদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকা উচিত। আখেরাত উদ্দেশ্য হলে শাগরেদরা এমনি হয়। কিন্তু দুনিয়া লক্ষ্য হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা হয়ে থাকে। যারা দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভের শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাইরে– اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই এবং তারা এ উক্তির বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ

اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ـ

যারা বন্ধু, তারা সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে; কিন্তু খোদাভীরুরা শত্রু হবে না।

দ্বিতীয় শিষ্টাচার হচ্ছে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শরীয়তের কর্ণধার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণ করবে। অর্থাৎ শিক্ষার জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাইবে না, কোন বিনিময়ের নিয়ত করবে না এবং কৃতজ্ঞতাও প্রত্যাশা করবে না। বরং কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে শিক্ষা দেবে। শাগরেদের প্রতি অনুগ্রহ হচ্ছে– এরূপ মনে করবে না; বরং শাগরেদদের অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং এরূপ মনে করা জরুরী যে, তুমি তাদেরই কারণে গৌরবের অধিকারী হয়েছ। তারা তাদের

আত্মশুদ্ধির কাজ তোমাকে সমর্পণ করেছে এবং তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ দিয়েছে; যেমন কোন ব্যক্তি তার ক্ষেত তোমাকে ধার দেয়, যাতে তুমি নিজের জন্যে তাতে ফসল উৎপন্ন কর। বলাবাহুল্য, এখানে ক্ষেতওয়ালার উপকারের তুলনায় তোমার উপকার বেশী হবে। সুতরাং শিক্ষাদানে শাগরেদের তুলনায় ওস্তাদের সওয়াব যখন বেশী হয়, তখন শাগরেদের উপর অনুগ্রহ করার কোন মানে নেই। শাগরেদ না হলে ওস্তাদ এ সওয়াব কোথায় পেত? তাই সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে চাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ـ

"বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" কেননা, ধনদৌলত ও দুনিয়ার সামগ্রী দেহের খাদেম এবং মনের সওয়ারী। তারা সকলেই এলেমের খেদমত করে। অতএব যেব্যক্তি এলেমের বিনিময়ে ধন-দৌলত চাইবে, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও জুতায় নাপাকী লেগে গেছে, সে তা পরিষ্কার করার জন্যে মুখে ঘষা দিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এতে যে খেদমতের যোগ্য, তাকে খাদেম করা হয় এবং যে খাদেম তাকে খেদমত পাওয়ার যোগ্য করা হয়। এটা চরম বিপ্লব। এ ধরনের লোক কেয়ামতে অপরাধীদের সাথে মাথা নীচু করে আল্লাহ তা'আলার সামনে দণ্ডায়মান হবে। মোট কথা, গৌরব ও সম্মান ওস্তাদের প্রাপ্য। এখন দেখ, যারা বলে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য তাদের লক্ষ্য, ফেকাহ ও কালামশাস্ত্র শিক্ষাদানে তাদের দশা কি হবে? তারা ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি ব্যয় করে এবং জায়গীর লাভের জন্যে রাজা-বাদশাহদের নানা রকম লাঞ্ছনা ভোগ করে। তারা এটা বর্জন করলে কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না এবং কেউ তাদের কাছে আসবে না। তদুপরি ওস্তাদ শাগরেদের কাছে আশা করে, সে তার প্রত্যেক বিপদে কাজে লাগবে, শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে সাহায্য করবে, অমঙ্গলকামীদের সাথে শত্রুতা রাখবে এবং তার জাগতিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি গাধার ন্যায় বহন করবে। যদি শাগরেদ এসব বিষয়ে সামান্যও ত্রুটি করে, তবে ওস্তাদজী তার আন্তরিক দুশমন হয়ে যায়। এ ধরনের আলেম নেহায়েত নীচ ও হীন।

তৃতীয় শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কোন

ত্রুটি করবে না। উদাহরণতঃ শাগরেদ যদি যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে কোন মর্তবা লাভের পেছনে পড়ে অথবা জাহেরী এলেম অর্জন করার পূর্বে বাতেনী এলেমে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে তাকে নিষেধ করবে। এরপর তাকে বলবে, জ্ঞান অন্বেষণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে করবে– প্রভাব প্রতিপত্তি অন্বেষণ ও গর্ব করার জন্যে নয়। এটা যে মন্দ, একথা যথাসম্ভব প্রথমেই তার মনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কেননা, পাপাচারী আলেমের মঙ্গল কম এবং অনিষ্ট বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং যদি ওস্তাদ শাগরেদের অন্তর থেকে জেনে নেয়, সে দুনিয়া লাভের জন্যেই এলেম অর্জন করছে এবং ফেকাহশাস্ত্রে বিতর্ক করার এবং আহকামে মুনাযারার শিক্ষা লাভ করছে, তবে তাকে বিরত রাখবে এবং বলে দেবে, এগুলো আখেরাতের শিক্ষা নয় এবং এমন শিক্ষাও নয়, যার সম্পর্কে জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে এলেম শিখছি, কিন্তু এলেম আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের এলেম হচ্ছে এলমে তফসীর, এলমে হাদীস ও এলমে আখেরাত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী মনীষীগণ মশগুল থাকতেন। যদি শাগরেদ দুনিয়ার উদ্দেশে এসব এলেম শেখে, তবে তাকে নিষেধ করবে না। কেননা, শাগরেদ ওয়ায়েয হওয়ার লোভে এবং মানুষকে তার দলভুক্ত করার আশায় এসব এলেম শিখতে তৎপর হয় এবং প্রায়ই শিক্ষাজীবনে এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। ফলে সে তার নিয়ত ঠিক করে নেয়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি এবং দুনিয়াকে তুচ্ছ ও আখেরাতকে বড় করে দেখার শিক্ষাও রয়েছে। এতে আশা করা যায়, পরিণামে শাগরেদ সঠিক পথে এসে যাবে।

ওস্তাদ যেসব বিষয়ের উপদেশ অন্যকে দেবে, সেগুলো নিজেও মেনে চলবে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাঁকজমক সৃষ্টির বাসনা এমন, যেমন পাখী শিকারের জালের চারপাশে দানা ফেলে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি কামভাব সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকে। জাঁকজমকপ্রীতি সৃষ্টি করার কারণও তাই যে, এর মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা কায়েম থাকবে। এটা উল্লিখিত শিক্ষাসমূহের মধ্যে হতে পারে। কিন্তু নিছক বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি শিক্ষা করা এবং কালাম শাস্ত্রের কলহ বিবাদ আয়ত্ত করা এমন যে, মানুষ এগুলোতেই মশগুল থাকলে এবং অন্য শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্তরের কঠোরতা,

আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গোমরাহীতে পড়ে থাকা ও জাঁকজমক প্রীতিই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোন উপকার হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা আপন রহমতে যাকে বাঁচিয়ে নেন অথবা যে এগুলোর সাথে অন্য ধর্মীয় শিক্ষাও মিলিয়ে নেয়, তার অবশ্য উপকার হতে পারে। একবার সুফিয়ান সওরীকে কেউ দুঃখিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমরা দুনিয়াদারদের জন্যে বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে গেছি। তারা এলেম শিক্ষা করার জন্যে আমাদের পেছনে পড়ে। এরপর যখন শিখে ফেলে, তখন বিচারক, গভর্নর অথবা দারোগা নিযুক্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ শিষ্টাচার, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উত্তম ও সঠিক পন্থা হল, শাগরেদকে কুচরিত্র থেকে যতদূর সম্ভব ইঙ্গিতে ও সস্নেহে নিষেধ করবে। কঠোর ভাষায় এবং ধমকের সুরে শাসাবে না। কেননা, স্পষ্ট ভাষা ভয়ভীতির পর্দা সরিয়ে দেয় এবং বিরুদ্ধাচরণে সাহস যোগায়। সেমতে ওস্তাদকুল শিরোমণি রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

"মানুষকে ছাগলের লেজ চূর্ণ করতে নিষেধ করা হলে তারা তা অবশ্যই চূর্ণ করবে আর বলবে, আমাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।"

হযরত আদম ও হাওয়ার কাহিনী এ বিষয়ের চমৎকার সাক্ষী। কাহিনী জেনে নেয়ার জন্যে আমরা তোমাকে এটা স্মরণ করিয়ে দেইনি, বরং তুমি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যাও। স্পষ্ট ভাষায় না বলার আরেক কারণ, যারা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী, তারা ইঙ্গিতে বললেও অর্থ বুঝে নেয় এবং বুঝে নেয়ার খুশী তাদেরকে আমল করতে উৎসাহিত করে- যাতে অন্যেরা জানে, বিষয়টি তার বুদ্ধিমত্তায় ধরা পড়েছে।

পঞ্চম শিষ্টাচার, ওস্তাদ যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয় তার উপরের শাস্ত্রসমূহের প্রতি শাগরেদের মন বীতশ্রদ্ধ করে না তোলা। উদাহরণতঃ যারা অভিধান শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস শাগরেদের সামনে ফেকাহকে মন্দ বলা এবং যারা ফেকাহ শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস হাদীস ও তফসীর শাস্ত্রের নিন্দা করা। তারা বলে ঃ হাদীস ও তফসীর নিছক ইতিহাসগত এবং শ্রবণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে বিবেকের কোন দখল নেই। কালামশাস্ত্রীরা ফেকাহকে ঘৃণা করে এবং বলে ঃ ফেকাহশাস্ত্র একটি শাখাগত ব্যাপার। এতে মহিলাদের মাসিকের কথা বর্ণিত হয়। এটা কালাম শাস্ত্রের মর্যাদা কিরূপে পেতে পারে, যাতে আল্লাহর সেফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়? ওস্তাদদের এ অভ্যাস খুবই মন্দ, যা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যে ওস্তাদ এক শাস্ত্র শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেয়, তার উচিত শাগরেদের মনে তার উপরের শাস্ত্র শিক্ষা করার পথও খুলে দেয়া।

ষষ্ঠ শিষ্টাচার, ওস্তাদ যেন এমন কোন কঠিন বিষয় বর্ণনা না করেন, যা হৃদয়ঙ্গম করতে শাগরেদের জ্ঞানবুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে, যাতে শাগরেদ ওস্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে অথবা তার বুদ্ধিবিভ্রাট না ঘটে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন ঃ আমরা পয়গম্বরগণ যেন মানুষকে তাদের স্তরে রেখে তাদের বুদ্ধি জ্ঞান অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলি- সেরূপ আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং শাগরেদ ভালরূপে বুঝবে- নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওস্তাদ শাগরেদের সামনে কোন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করবে না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের বোধগম্য নয়, তখন তাদের কিছু লোকের জন্য এটা ফেতনা হয়ে যায়। একবার হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এর মধ্যে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে, যদি এগুলোর সমঝদার থাকে। অর্থাৎ, আমি এসব জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করি না। কারণ, সমঝদার নেই। তিনি সত্যই বলেছেন ঃ নেক বান্দাদের অন্তর রহস্যের আধার। এ থেকে জানা গেল, আলেম যা জানে, তা যে কোন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। এটা তখন, যখন শিক্ষার্থী বুঝে, কিন্তু উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর যখন বুঝেই না, তখন তার কাছে না বলা অধিক সঙ্গত। ঈসা (আঃ) বলেন ঃ শূকরের গলায় মণি-মাণিক্য পরায়ো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান মণি-মাণিক্যের চেয়ে উত্তম এবং যেব্যক্তি জ্ঞানকে খারাপ মনে করে, সে শূকরের চেয়ে অধম, এজন্যেই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ প্রত্যেককে তার বুদ্ধির মাপকাঠি অনুযয়ী মাপ এবং তদনুযায়ী তার সাথে কথা বল, যাতে তুমি তার কাছ থেকে বেঁচে থাক এবং এবং সে তোমার দ্বারা উপকৃত হয়। নতুবা সে মনোবলের সংকীর্ণতার কারণে মানবে না। জনৈক ব্যক্তি এক আলেমকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীস শুনেননি, যেব্যক্তি উপকারী এলেম গোপন

করে, কেয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে। আলেম বললেন ঃ লাগামের কথা রাখ এবং চলে যাও। যদি কোন সমঝদার আসে এবং এলেম গোপন করি, তখন সে আমাকে লাগাম পরিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ

তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নির্বোধদের হাতে সমর্পণ করো না।

এতে হুশিয়ার করা হয়েছে, এলেম যেব্যক্তিকে খারাপ করে দেয় এবং বিভ্রান্তিতে ফেলে, তাকে এলেম থেকে বিরত রাখা উত্তম। অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন বস্তু দেয়া যোগ্যকে না দেয়ার তুলনায় কম জুলুম নয়; বরং উভয় কাজ সমান জুলুম।

সপ্তম শিষ্টাচার, যখন শাগরেদের অবস্থা জানা যায় যে, তার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, তখন ওস্তাদ তাকে তার উপযুক্ত স্থূল বিষয় বলে দেবেন এবং এতে সূক্ষ্ম কথাও আছে, একথাও তাকে বলবেন না। কেননা, এরূপ বললে সেই স্থূল বিষয়ে শাগরেদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাবে। তার মন বিক্ষিপ্ত হবে এবং বলবে, তাকে শিক্ষাদানে কুণ্ঠাবোধ করা হচ্ছে। নিজের ধারণায় প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, সে প্রতিটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপযুক্ত। প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার প্রতি এজন্যে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন। অথচ বাস্তবে সেই বেশী নির্বোধ, যে তার বুদ্ধি পূর্ণ হওয়ার ধারণায় বেশী আনন্দিত হয়। এ থেকে জানা যায়, সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেউ শরীয়ত অনুসারী হয় এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ নতুন ব্যাখ্যা ছাড়াই তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তার বিশ্বাসকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়; বরং তাকে তার কাজে মশগুল থাকতে দেয়া উচিত। কেননা, তার সামনে বাহ্যিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলে সে সাধারণের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে দাখিল হওয়া তার জন্যে সহজ হবে না। ফলে তার মধ্যে ও গোনাহের মধ্যে যে আড়াল ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। এর পর সে পুরোপুরি অবাধ্য শয়তান হয়ে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে। সুতরাং সাধারণের সামনে সূক্ষ্ম জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করা উচিত নয়; বরং তাদেরকে কেবল এবাদত এবং যেসব কাজ তারা করে, তাতে ঈমানদারী শিক্ষা দেয়া সমীচীন। কোরআনের বিষয়বস্তু অনুযায়ী জান্নাতের

আগ্রহ এবং দোযখের ভয় দ্বারা তাদের অন্তর পূর্ণ করে দেয়া উচিত। তাদের সামনে কোন সন্দেহের অবতারণা করা যাবে না। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ তাদের মনে আটকে থাকে এবং তা বের হওয়া কঠিন হয়। ফলে তারা বরবাদ হয়ে যায়। সারকথা, সাধারণ লোকদের জন্যে বিতর্কের দ্বার উন্মোচিত করা উচিত নয়।

অষ্টম শিষ্টাচার, ওস্তাদ স্বীয় এলেম অনুযায়ী আমল করবেন। তার কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল থাকতে পারবে না। কারণ, এলেম অন্তরের চক্ষু দ্বারা জানা যায়, আর আমল বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা। বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখে এমন লোক অনেক। এমতাবস্থায় আমল এলেমের বিপরীত হলে হেদায়েত হবে না। যেব্যক্তি নিজে এক কাজ করে এবং অপরকে তা ক্ষতিকারক বলে করতে নিষেধ করে, মানুষ তার সাথে উপহাস করে এবং সেই কাজ করতে অধিক আগ্রহী হয়। তারা বলে, এ কাজটি ভাল ও আনন্দদায়ক না হলে ওস্তাদজী করেন কেন? ওস্তাদ ও শাগরেদ বাঁশ ও তার ছায়ার মত। যদি বাঁশ নিজে সোজা না হয়, তবে ছায়া সোজা হবে কিরূপে? আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ -

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও?

এতদসত্ত্বেও আলেমের উপর গোনাহের শাস্তি জালেমের তুলনায় বেশী হয়। কেননা, আলেম গোনাহে লিপ্ত হলে এক বিশ্ব গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। মানুষ তার অনুসরণ করে। যেব্যক্তি কোন কুরীতি আবিষ্কার করে, তার উপর নিজের এবং যারা এ কুরীতির অনুসরণ করে তাদের গোনাহ্ বর্তে থাকে। এ জন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ দু'ব্যক্তি আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে– এক, সেই আলেম, যে তার ইজ্জত হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। দুই, সেই মূর্খ, যে দরবেশ হওয়ার ভান করছে। কেননা, মূর্খ দরবেশ হয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং আলেম গোনাহ্ করে বিভ্রান্তি ছাড়ায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের আলামত

ভাল আলেম সম্পর্কে বর্ণিত শাস্তিবাণী থেকে জানা যায়, কেয়ামতে অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিকতর কঠোর শাস্তি মন্দ আলেমদের উপরই হবে। তাই যেসকল আলামত ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের মধ্যে পার্থক্য করে, সেগুলো জানা জরুরী। আমাদের মতে দুনিয়ার আলেম মানে মন্দ আলেম, যাদের উদ্দেশ্য এলেম দ্বারা দুনিয়া উপভোগ করা এবং দুনিয়াবাসীদের কাছে সম্মান, জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সকল মানুষের তুলনায় কঠোর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা এলেম দ্বারা কোন উপকার দেননি। তিনি আরও বলেন ঃ এলেম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত মানুষ আলেম হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে–

العلم علمان علم على اللسان فذالك حجة الله تعالى على ابن ادم وعلم فى القلب وذالك العلم النافع .

এলেম দু'প্রকার– এক মৌখিক এলেম। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জব্দ করবেন। দুই, অন্তরস্থিত এলেম। এটাই উপকারী এলেম। আরও বলেন ঃ শেষ যমানায় এবাদতকারী মূর্খ হবে এবং আলেম পাপাচারী হবে। আরও বলেন ঃ আলেমদের সাথে গর্ব করা, বোকাদের সাথে তর্ক করা এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করো না। যে এরূপ উদ্দেশে এলেম শিখবে, সে দোযখে যাবে। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের এলেম গোপন করবে, আল্লাহ্ তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। আরও বলেন ঃ অবশ্যই আমি দাজ্জালকে ততটুকু ভয় করি না, যতটুকু দাজ্জাল নয় এমন ব্যক্তিকে ভয় করি। প্রশ্ন করা হল ঃ সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি পথভ্রষ্টকারী শাসকদেরকে ভয় করি। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেমে বেশী এবং

হেদায়েতে কম, সে আল্লাহ্ তাআলার থেকে বেশী দূরে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ কতদিন তুমি শেষ রাত্রের পথিকদের জন্যে পথ পরিষ্কার করবে এবং নিজে বিস্ময়াবিষ্টদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে? এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এলেমের বড় বিপদ। কেননা, আলেম ব্যক্তি হয় চিরতরে ধ্বংস হওয়ার পথে, না হয় চিরন্তন সৌভাগ্যের পথে থাকে। এলেমে ডুব দিয়ে যদি সৌভাগ্য না হয়, তবে নিরাপত্তা থেকেও বঞ্চিত থাকবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের জন্যে আমি মোনাফেক আলেমকে অধিক ভয় করি। প্রশ্ন করা হল ঃ মোনাফেক আবার আলেম হবে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ যে মুখে মুখে আলেম কিন্তু অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে জাহেল, সেই মোনাফেক আলেম। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে হয়ো না, যারা আলেম ও দার্শনিকদের মত এলেম রাখে; কিন্তু আমলে মূর্খদের সমান। এক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি এলেম শিক্ষা করতে চাই, কিন্তু ভয় হয়, কোথাও তা বিনষ্ট না করে দেই। তিনি বললেন ঃ তোমার এলেম ত্যাগ করে বসাই এলেম বিনষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। ইবরাহীম ইবনে ওকবাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অনুতাপ কার হয়? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সেই সর্বাধিক অনুতপ্ত হয়, যে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করে। মৃত্যুর সময় সেই আলেম সর্বাধিক অনুতপ্ত হবে, যে আমলে ত্রুটি করেছে। খলীল ইবনে আহমদ বলেন ঃ মানুষ চার প্রকার– এক, যে বাস্তবে জানে এবং এটাও জানে যে, সে জানে, এরূপ ব্যক্তি আলেম। তার অনুসরণ কর। দুই, যে জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সে জানে। সে নিদ্রিত। তাকে জাগাও। তিন, যে জানে না কিন্তু এটা জানে যে, সে জানে না। এরূপ ব্যক্তি হেদায়েতের যোগ্য। তাকে হেদায়েত কর। চার, যে জানে না এবং এটাও জানে না যে, সে জানে না, সে মূর্খ। তাকে বর্জন কর। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ এলেম আমলকে ডাকে। আমল সাড়া না দিলে এলেম বিদায় হয়ে যায়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ মানুষ যতক্ষণ এলেম অন্বেষণে থাকে, ততক্ষণ সে আলেম। আর যখন মনে করে, তার জানা হয়ে গেছে, তখন সে জাহেল। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আমার দয়া হয়– এক, যে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত ছিল, এরপর লাঞ্ছিত হয়ে গেছে। দুই, যে ধনী ছিল, এখন নিঃস্ব হয়ে গেছে। তিন, যে আলেমকে

নিয়ে দুনিয়া খেলা করে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন ঃ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু। আর অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা। এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার অর্থ এই ঃ আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে হেদায়েত ছেড়ে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে। যে দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে তার জন্যে আরও আশ্চর্য লাগে। তাদের চেয়ে অধিক আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে অপরের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রয় করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ان العالم ليعذب عذابا يطوف به اهل النار استعظاما لشدة عذابه ۔

আলেমকে এমন কঠোর আযাব দেয়া হবে, যার কঠোরতার কারণে দোযখীরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এতে বিপথগামী আলেমের আযাবের কথা বলা হয়েছে। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق اقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطوف به اهل النار فيقولون مالك فيقول كنت امر بالخير ولا اتيه وانهى عن الشروات به ۔

কেয়ামতের দিন আলেমকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা যাঁতাকল নিয়ে ঘুরে। দোযখীরা তার আশেপাশে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে– তোমার এ পরিণতি কেন? সে বলবে ঃ আমি অপরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম, নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম।

গোনাহের কারণে আলেমের আযাব দ্বিগুণ হওয়ার কারণ, সে জেনে শুনে নাফরমানী করে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۔

অর্থাৎ, "মোনাফেক দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" কারণ, তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে খৃস্টানদের চেয়ে অধিক ঘৃণিত বলেছেন; অথচ ইহুদীরা আল্লাহ তাআলাকে ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ (তিন জনের তৃতীয় জন) বলেনি, কিন্তু তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। সেমতে আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ তারা তাকে চেনে যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। অন্যত্র বলেন ঃ فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ তাদের পরিচিতজন যখন তাদের কাছে আসল, তারা তাকে অস্বীকার করে বসল। অতএব আল্লাহর অভিসম্পাত অস্বীকারকারীদের উপর।

বালআম ইবনে বাউরার কাহিনীতে বলা হয়েছে–

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ وَتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۔

"তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম। অতঃপর সে সেগুলো থেকে বের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান তার পেছনে লাগল এবং সে পথভ্রান্তদের দলভুক্ত হয়ে গেল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে তাকে এগুলো দ্বারা উপরে তুলে নিতে পারতাম, কিন্তু সে পৃথিবীতে স্থায়ী হল এবং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করল। অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়। তুমি তার উপর বোঝা চাপালে হাঁপায় এবং ছেড়ে দিলেও হাঁপায়।

পাপাচারী আলেমের অবস্থাও তদ্রূপ। বালআমও আল্লাহর কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সে কামনাকে আঁকড়ে রইল। তাই তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে জ্ঞান প্রাপ্ত হোক না হোক সর্বাবস্থায় হাঁপায়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ মন্দ আলেমরা এমন, যেমন নালার

মুখে কোন পাথর রেখে দেয়া হয়। সে নিজেও পানি পান করে না এবং তা ফসলের ক্ষেতে প্রবাহিত হতেও দেয় না। এসব হাদীস ও স্মরণীয় বাণী থেকে জানা যায়, দুনিয়াদার আলেম জাহেলের তুলনায়ও শোচনীয় অবস্থা এবং কঠোর আযাবে থাকবে। যারা সফলকাম ও নৈকট্যশীল আলেম, তাঁরা ভাল আলেম অর্থাৎ, আখেরাতের আলেম। তাঁদের অনেক আলামত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি, তাঁরা তাঁদের এলেম দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করেন না। কেননা, আলেমের সর্বনিম্নস্তর, সে দুনিয়ার হেয়তা, নীচতা, মলিনতা, স্থায়িত্বহীনতা এবং আখেরাতের মাহাত্ম্য, স্থায়িত্ব, তার নেয়ামতের পরিচ্ছন্নতা এবং রাজত্বের বিশালতা জেনে নেবে। সে আরও জানবে, দুনিয়া ও আখেরাত একে অপরের বিপরীত– দু'সতীনের মত– একজনকে খুশী করলে অন্যজন নাখোশ হয়ে যায়; নিক্তির দু'পাল্লার মত– একটি যতই নীচে ঝুঁকে, অপরটি ততই উপরে উঠে। অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মত– যতই একটির নিকটে যাবে ততই অপরটি থেকে দূরে সরে পড়বে। অথবা দুপেয়ালার মত– একটি ভর্তি ও অপরটি খালি; ভর্তিটি থেকে যে পরিমাণে খালিটি ভরবে, সেই পরিমাণে ভর্তিটি খালি হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি দুনিয়াকে এরূপ জানে না, তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। কারণ এটা দেখা ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই জানা যায়। যার জ্ঞান বুদ্ধিই ত্রুটিযুক্ত, সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি আখেরাতের মাহাত্ম্য ও স্থায়িত্ব বুঝে না, সে কাফের, ঈমান বর্জিত। যার ঈমানই নেই সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের বৈপরীত্য জানে না, সে পয়গম্বরগণের শরীয়ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং কোরআন পাক আদ্যোপান্ত অস্বীকার করে। এহেন ব্যক্তি আলেমরূপে গণ্য হবে কিরূপে? যেব্যক্তি এসব বিষয় জেনে আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেয় না, সে শয়তানের বন্দী। তার কামনা বাসনা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য তার উপর প্রবল হয়ে গেছে। এরূপ ব্যক্তিও আলেমদের দলভুক্ত হতে পারে না। হযরত দাউদ (আঃ)-এর রেওয়ায়েতেসমূহে আল্লাহ তাআলার উক্তি এভাবে বর্ণিত আছে– আলেম ব্যক্তি যখন তার কামনা অবলম্বন করে, তখন আমি তাকে সামান্যতম শাস্তি এই দেই যে, তাকে আমার মোনাজাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে দেই। হে দাউদ! আমার অবস্থা এমন আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করো না, যাকে দুনিয়া পাগলপারা করে দিয়েছে। তা হলে সে

তোমাকে আমার মহব্বতের পথে বাধা দেবে। এ ধরনের লোক আমার বান্দাদের জন্যে ডাকাতস্বরূপ। হে দাউদ! তুমি কাউকে আমাকে অন্বেষণ করতে দেখলে তার খাদেম হয়ে যাও। হে দাউদ! যেব্যক্তি কোন পলাতক বান্দাকে আমার দিকে সরিয়ে আনে, আমি তাকে সতর্ককারী ও দায়িত্ববানরূপে লিপিবদ্ধ করি, তাকে কখনও শাস্তি দেই না। এ জন্যেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু। অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া কামনা করা। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাযী বলেন ঃ এলেম ও জ্ঞান দ্বারা যখন দুনিয়া কামনা করা হয়, তখন তার জ্যোতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মসঊদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন ঃ আলেম যখন কথা ফাঁস করে, তখন সে চোর। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি আলেমকে দুনিয়া প্রত্যাশী দেখ, তখন তাকে দ্বীনের ব্যাপারে দোষী মনে কর। কেননা, যে সে বিষয়ের প্রত্যাশী, সে তাতেই মগ্ন থাকে। মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি এক পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করেছি– আলেম যখন দুনিয়াকে মহব্বত করে, তখন আমি নিম্নতম শাস্তিস্বরূপ মোনাজাতের মিষ্টতা তার মন থেকে দূর করে দেই। জনৈক ব্যক্তি তার ভ্রাতাকে লেখল ঃ তোমাকে এলেম দান করা হয়েছে। এখন এলেমের নূর গোনাহের অন্ধকার দ্বারা নির্বাপিত করো না। নতুবা যেদিন আলেমগণ তাদের এলেমের আলোকে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায রাযী দুনিয়াদার আলেমদেরকে বলতেন ঃ আলেমগণ! তোমাদের প্রাসাদ কায়সারের মত এবং গৃহ কেসরার মত। তোমাদের পোশাক খুব পরিপাটি, মোজা জালুতের মত, সওয়ারী কারূনের মত, পাত্র ফেরআউনের মত, গোনাহ মূর্খের মত এবং মাযহাব শয়তানের মত। অতএব মুহাম্মদী শরীয়ত কোথায়? জনৈক ব্যক্তি একজন সাধককে জিজ্ঞেস করল ঃ যেব্যক্তি গোনাহ করলে শাস্তি পায়, আপনার মতে সে কি আল্লাহ তাআলাকে চেনে না? সাধক বললেন ঃ যার কাছে দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার রাখে, সে আল্লাহ তাআলাকে চেনে না– এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আখেরাতের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে ধন-সম্পদ বর্জন করা যথেষ্ট– এরূপ মনে করো না। কেননা, আড়ম্বরপ্রীতির ক্ষতি ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী। এ জন্যেই বিশর (রহঃ) বলেন– حدثنا

শব্দটি যা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, দুনিয়ার দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। তিনি দশ বস্তারও কিছু বেশী কিতাব দাফন করে দেন এবং বলেন ঃ আমার হাদীস বর্ণনা করার স্পৃহা আছে। এ স্পৃহা দূর হয়ে গেলে পরে হাদীস বর্ণনা করব। তাঁরই অথবা অন্য কোন বুযুর্গের উক্তি, যখন তোমার হাদীস বলার ইচ্ছা হয় তখন চুপ করে থাক। আর যখন ইচ্ছা না হয়, তখন হাদীস বর্ণনা কর। কারণ, শিক্ষাদান ও পথপ্রদর্শকের পদমর্যাদায় যে জাঁকজমকপ্রীতি আছে, তা সকল জাগতিক আনন্দের চেয়ে বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে তার ইচ্ছা অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য হবে। এ কারণেই সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ হাদীসের ফেতনা ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ফেতনার চেয়ে অধিক। এ ফেতনা অধিক ভয় করার যোগ্য বিধায় আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলেছেন–

وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ـ

"আমি যদি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম, তবে তাদের প্রতি আপনার মন সামান্য ঝুঁকে পড়ত।"

সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষ মৃত। আমেল ব্যতীত আলেমগণও সকলেই মাতাল। এখলাস ছাড়া সকল আমেলও ভ্রান্ত। যাদের এখলাস আছে তারাও ভীত, তাদের পরিণাম কি হবে? আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন হাদীস তলব করে অথবা বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে, তখন সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হাদীস তলবের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য থাকে উচ্চ সনদ লাভ অথবা এমন হাদীস তলব করা, যার প্রয়োজন আখেরাতে নেই। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির গতি আখেরাতের দিকে এবং সে দুনিয়ার পথে ধাবমান হয়, সে আলেম হবে কিরূপে? সালেহ ইবনে হাস্‌সান নফরী বলেন ঃ আমি অনেক বড় বড় ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা সকলেই হাদীসের পাপাচারী আলেম থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى

يصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ـ

"যে শিক্ষা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, কেউ যদি সেই শিক্ষা দুনিয়ার অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে অন্বেষণ করে, তবে সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"

আল্লাহ তা'আলা মন্দ আলেমের এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, সে এলেম দ্বারা দুনিয়া ভক্ষণ করে। তিনি ভাল আলেমের গুণস্বরূপ বিনয় ও সংসারের প্রতি অনাসক্তি উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার আলেম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ فَنَبَذُوْهُ وَرَاۤءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ـ

"যখন আল্লাহ তা'আলা কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন, তারা এই কিতাব মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা এই অঙ্গীকার পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং এর বিনিময়ে সামান্য দুনিয়া ক্রয় করে নিল। আখেরাতের আলেমদের শানে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۤئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ـ

"কিতাবধারীদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর জন্যে বিনয়াবনত হয়ে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে না। তাদের জন্যেই তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে।"

জনৈক মনীষী বলেন ঃ আলেমগণ পয়গম্বরগণের দলভুক্ত হয়ে উত্থিত হবে। বিচারকদের হাশর হবে রাজা বাদশাহদের দলে। যে ফেকাহবিদ এলেম দ্বারা দুনিয়া হাসিল করে, সে-ও বিচারকদের অনুরূপ। আবু দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জনৈক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, যারা দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশে ফেকাহবিদ হয়, আমল না করার জন্যে এলেম শেখে, আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করে, মানুষের দৃষ্টিতে ছাগলের চামড়া পরিধান করে এবং তাদের অন্তর ব্যাঘ্রের মত, মুখ মধুর চেয়ে মিষ্ট, অন্তর ইলুয়ার চেয়ে তিক্ত, আমাকেই প্রতারণা করে এবং আমার সাথেই ঠাট্টা করে, তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের জন্যে এমন অনর্থ সৃষ্টি করব, যা সহনশীল ব্যক্তিও সইতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের আলেম দুব্যক্তি– এক, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, সে মানুষের মধ্যে তা ব্যয় করে এবং অর্থের লোভ করে না। এরূপ ব্যক্তির প্রতি আকাশের পাখী, সমুদ্রের মাছ, পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু এবং কেরামান কাতেবীন রহমতের দোয়া করে। সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে নেতা ও সম্ভ্রান্ত হয়ে আসবে; এমনকি, রসূলগণের সঙ্গে থাকবে। দুই, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, কিন্তু সে তা মানুষকে দান করতে কৃপণতা করে, অর্থের লোভ করে এবং এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট দুনিয়া ক্রয় করে। এরূপ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় আসবে। জনৈক ঘোষক মানুষের সামনে ঘোষণা করবে– সে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে এলেম দিয়েছিলেন কিন্তু, সে কৃপণতা করেছে। মানুষকে এলেম শেখায়নি এবং লোভের হাত প্রসারিত করেছে। সকল মানুষের হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আযাবের মধ্যে থাকবে।

এর চেয়েও কঠোর রেওয়ায়েত এটি– এক ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমত করত। সে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আমাকে মূসা সফিউল্লাহ একথা বলেছেন, মূসা নাজিউল্লাহ এরূপ বলেছেন এবং মূসা কলীমুল্লাহ এমন বলেছেন। অবশেষে তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ হয়ে যায়। সেব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) তার খোঁজ নিতে শুরু করলেন; কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে এক ব্যক্তি একটি শূকরের গলায় কালো রশি বেঁধে উপস্থিত

হল এবং আরজ করল ঃ আপনি অমুক ব্যক্তিকে চেনেন? মূসা (আঃ) বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল ঃ এ শূকরটিই সেব্যক্তি। মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী! একে আসল আকৃতিতে ফিরিয়ে দিন, যাতে তাকে এরূপ দশা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন। আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পয়গম্বরগণ ও ওলীগণ আমাকে যেসব গুণে ডেকেছে, যদি তুমি সেসব গুণে আমাকে আহ্বান কর, তবুও আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করব না, কিন্তু যে কারণে আমি তার আকৃতি বিকৃত করে দিয়েছি, তা বলে দিচ্ছি। এ ব্যক্তি দ্বীনের বদলে দুনিয়া অন্বেষণ করত।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আরও কঠোর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আলেমের কাছে বলা যদি শ্রবণের চেয়ে উত্তম হয়, তবে এটা তার জন্যে একটি বিপদ। অথচ বলার মধ্যে সাজানো গুছানো ও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। বক্তা ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে না। চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা ও বুদ্ধিমত্তা নিহিত। কোন কোন আলেম তাদের এলেম কুক্ষিগত করে রাখে; অন্যের কাছেও এলেম থাকুক এটা তারা চায় না। এরূপ আলেম দোযখের প্রথম স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম এলেমের ব্যাপারে বাদশাহর মত হয়ে থাকে। কোন আপত্তি তোলা হলে অথবা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে, তারা রেগে-মেগে আগুন হয়ে যায়। এরূপ আলেম দোযখের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম তাদের এলেম ও উত্তম হাদীসগুলো বিশেষভাবে ধনীদের জন্যে উৎসর্গ করে, যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে এই এলেমের যোগ্য মনে করে না। এরূপ আলেম দোযখের তৃতীয় স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম নিজেদেরকে মুফতী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পদ গ্রহণকারীদেরকে পছন্দ করেন না। এরূপ আলেম দোযখের চতুর্থ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম দোযখের পঞ্চম স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম নিজের এলেমকে মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের উপায় সাব্যস্ত করে। এরূপ আলেম দোযখের ষষ্ঠ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম অহংকার ও আত্মম্ভরিতাকে নগণ্য বলে মনে করে, রূঢ় ভাষায় ওয়ায করে এবং কেউ উপদেশ দিলে নাক সিঁটকায়। এরূপ আলেম দোযখের সপ্তম স্তরে থাকবে। তোমার উচিত এলেমে চুপ থাকা, যাতে শয়তানের উপর প্রবল

হতে পার। কোন হাসির কথা ছাড়া কখনও হাসবে না এবং প্রয়োজন ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না। অন্য এক হাদীসে আছে-

ان العبد لينتشر له من الثناء ما يملا ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضه -

অর্থাৎ, "মানুষের সুখ্যাতি এত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, যা পূর্ব ও পশ্চিমকে পূর্ণ করে দেয়। অথচ আল্লাহর কাছে তা মাছির ডানার সমানও নয়।"

আরও বর্ণিত আছে, একবার হযরত হাসান বসরী ওয়াযের মজলিস থেকে উঠলে জনৈক খোরাসানী বিত্তশালী ব্যক্তি পাঁচ হাজার দেরহাম ও দশ থান চিকন কাপড়ের একটি পুঁটলি তাঁকে নযরানা হিসাবে পেশ করল। সে আরজ করল ঃ দেরহামগুলো খরচ করার জন্যে আর কাপড় পরিধান করার জন্যে পেশ করলাম। হযরত হাসান বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আপদমুক্ত রাখুন। এই দেরহাম ও থান তুলে নাও এবং নিজের কাছেই রেখে দাও। আমার এর প্রয়োজন নেই। যেব্যক্তি আমার মজলিসে বসে এমন নযরানা কবুল করে, সে যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে যাবে, তখন তার দ্বীনদারী থাকবে না। জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কোন আলেমের কাছে বসো না; বরং এমন আলেমের কাছে বসো, যে পাঁচটি বিষয় থেকে পাঁচটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করে- (১) সন্দেহ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে, (২) রিয়া থেকে এখলাসের দিকে, (৩) সংসারাসক্তি থেকে সংসার ত্যাগের দিকে, (৪) অহংকার থেকে বিনয়ের দিকে, (৫) শত্রুতা থেকে শুভেচ্ছার দিকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ وَّقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّلَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ -

অর্থাৎ, অতঃপর কারূন সেজেগুজে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ হায়, কারূনের মত ধন আমরা কিরূপে পাব! নিশ্চয় সে মহা ভাগ্যবান। আর যারা এলেম প্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল ঃ তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া সওয়াব তাদের জন্যে উত্তম, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে। একথা তাদের মনেই লাগে, যারা সবরকারী।

এ আয়াতে আলেমদের এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তা অবলম্বন করে। আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁদের কাজ কথার বিপরীত হয় না। বরং তাঁরা কোন কাজ করার কথা তখনই বলেন, যখন নিজেরা তা করে নেন। আল্লাহ বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের কথা বল আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

তোমরা যা করবে না তা বলবে, এটা আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে-

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ -

তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করি, আড়ালে আমি করব- এটা আমি চাই না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ - আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا -আল্লাহকে ভয় কর এবং জ্ঞানার্জন কর। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا -আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বললেন ঃ হে মরিয়ম তনয়, নিজেকে উপদেশ দাও। নিজে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে গেলে অপরকে উপদেশ দাও। নতুবা আমাকে লজ্জা কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مررت ليلة اسرى بى باقوام كان تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت من انتم قالوا كنا نأمر بالخير ولا ناتيه وننهى عن الشر وناتيه ـ

অর্থাৎ, মে'রাজের রাতে আমি এমন লোকদের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি বললাম ঃ তোমরা কারা? তারা বলল ঃ আমরা অপরকে সৎকাজ করতে বলতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না। অপরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেরা তা করতাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পাপাচারী আলেম ও মূর্খ আবেদের কারণে আমার উম্মত বরবাদ হবে। সকল মন্দের মন্দ হচ্ছে মন্দ আলেম এবং সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভাল আলেম। আওযায়ী বলেন ঃ খৃস্টানদের গোরস্থান এই মর্মে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করল যে, কাফের মৃতদের দুর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলে পাঠালেন ঃ মন্দ আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ তোমাদের মধ্যকার দুর্গন্ধের চেয়ে বেশী। ফোযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ আমি শুনেছি, কেয়ামতে পৌত্তলিকদের পূর্বে মন্দ আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যে জানে না, তার তো একবার দুর্ভোগ হবে; আর যে জানে এবং আমল করে না, তার দুর্ভোগ হবে সাত বার। শা'বী (রহঃ) বলেন, জান্নাতের কিছু লোক দোযখের কোন কোন লোককে দেখে বলবেন ঃ তোমরা দোযখে গেলে কেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের শিক্ষা দানের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন? তারা বলবে ঃ আমরা অপরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা পালন করতাম না। হাতেম আসাম্ম (রহঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সেই আলেমের চেয়ে অধিক অনুতাপ আর কারও হবে না, যে মানুষকে এলেম শিক্ষা দিয়েছে এবং মানুষ তদনুযায়ী আমল করেছে, কিন্তু সে আমল করেনি। মানুষ তো তার সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে ধ্বংস হয়েছে।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আলেম যখন তার এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তখন তার উপদেশ মানুষের মন থেকে এমনভাবে ফসকে যায়, যেমন মসৃণ পাথরের উপর থেকে পানির ফোঁটা

গড়িয়ে পড়ে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ মক্কা মোয়াজ্জমায় আমি এক পাথরের কাছ দিয়ে গেলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ আমাকে উল্টিয়ে জ্ঞান অর্জন কর। আমি পাথরটি উল্টিয়ে দিলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ তুমি যা জান, তদনুযায়ী আমল কর না। সুতরাং এমন বিষয় কেন জানতে চাও, যা তোমার জানা নেই। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ অনেক মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহকে ভুল বসে আছে। অনেকে আল্লাহর সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু নিজেরা ভয়হীন। অনেক মানুষ অপরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অনেক মানুষ আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, কিন্তু তার আয়াতসমূহ থেকে দূরে থাকে।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ আমরা যখন কথাবার্তা শুদ্ধ করলাম, তখন তাতে আর ভুল করলাম না, কিন্তু আমলে ভুল করলাম, তা ঠিক করিনি। আওযায়ী বলেন ঃ যখন বক্তব্যে অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে যায়, তখন বিনয় ও নম্রতা অবশিষ্ট থাকে না। আবদুর রহমান ইবনে গনম বলেন ঃ আমার কাছে দশ জন সাহাবী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে কোবায় জ্ঞানচর্চায় রত ছিলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে তশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ যে পরিমাণ ইচ্ছা শিখে নাও, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সওয়াব দেবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম শেখে এবং তদনুযায়ী আমল করে না, সে এমন, যেমন কোন নারী সংগোপনে যিনা করে এবং গর্ভ সঞ্চার হয়ে যায়। এর পর যখন গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন সে লাঞ্ছিত হয়। যেব্যক্তি এলেম অনুযায়ী আমল করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাকেও কেয়ামতের দিন সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত করবেন। হযরত মুআয (রহঃ) বলেন ঃ আলেমের পদস্খলনকে ভয় কর। কেননা, মানুষের মধ্যে তার কদর বেশী। তার পদস্খলনে মানুষ তার অনুসরণ করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন আলেমের পদস্খলন ঘটে, তখন তার পদস্খলনে এক বিশ্ব পদস্খলিত হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে দুনিয়ার মানুষ বরবাদ হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আলেমের পদস্খলন। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এমন এক সময় আসবে, যখন মনের মিষ্টতা তিক্ত হয়ে যাবে। তখন

এলেম দ্বারা আলেমের উপকার হবে না এবং তালেবে এলেমও উপকৃত হবে না। তখন আলেমদের অন্তর হবে লোনা মাটির মত, যার উপর পানির ফোঁটা পড়লেও সামান্য মিষ্টতাও অনুভূত হয় না। এটা তখন হবে যখন আলেমদের অন্তর দুনিয়ার মহব্বতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তখন আল্লাহ তাআলা অন্তর থেকে জ্ঞানের ঝরণা বের করে হেদায়েতের প্রদীপ নির্বাপিত করে দেবেন। তখন আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা মুখে বলবে ঃ আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু পাপাচার তাদের আমলের মধ্যে প্রকট থাকবে। ভাষার ছড়াছড়ি হবে এবং অন্তর দুষ্প্রাপ্য হবে। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, এটা এজন্যে হবে যে, ওস্তাদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখাবে এবং শাগরেদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখবে। তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত আছে– যে বিষয় তুমি জান না, তার এলেম অন্বেষণ করো না, যতটুকু জান তদনুযায়ী আমল কর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে যমানায় রয়েছ, তাতে কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতি সত্বর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ অনুযায়ী আমল করলেও মুক্তি পেয়ে যাবে। এটা হবে মিথ্যুকদের আধিক্যের কারণে। জেনে রাখ, আলেম হল কাযী তথা বিচারপতির মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

القضاة ثلثة قاضى قضى بالحق وهو يعلم فذالك فى الجنة وقاضى قضى بالجور وهو يعلم اولا يعلم فهما فى النار ـ

অর্থাৎ, বিচারপতি তিন প্রকার– এক, যে সত্য বিচার করে এবং সে আলেম। সে জান্নাতে থাকবে। দুই, যে অন্যায় বিচার করে এবং সে আলেম অথবা– তিন, আলেম নয়। এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে।

কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় এমন আলেম হবে, যারা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হতে বলবে এবং নিজেরা অনাসক্ত হবে না, মানুষকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং নিজেরা ভয় করবে না, মানুষকে শাসকবর্গের কাছে যেতে বারণ করবে এবং নিজেরা তাদের কাছে যাবে। এরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়া অবলম্বন করবে এবং মুখের জোরে

খাবে। ধনীদেরকে কাছে বসাবে– ফকীরদেরকে নয়। এরা এলেম নিয়ে লড়াই করবে, যেমন নারীরা পুরুষকে নিয়ে লড়াই করে। তাদের কোন সহচর অপরের কাছে বসলে তারা তার উপর রাগান্বিত হবে। এরা হবে অহংকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার দুশমন।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান কোন সময় এলেমের মাধ্যমেই তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ শয়তান বলবে– এলেম শেখ এবং শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমল করো না। সুতরাং মানুষ এলেমে ব্যাপৃত থাকবে এবং আমলে টালবাহানা করবে। অবশেষে সে কোন আমল না করেই মারা যাবে। সিররী সকতী (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি এলমে জাহেরের প্রতি লোভী ছিল। সে এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করলে আমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, কেউ বলছে ঃ আল্লাহ তোমাকে বিনাশ করুন, তুমি এলেমকে আর কত নাশ করবে? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমি তো এলেমকে স্মরণ করি। সে বলল ঃ এলেমকে স্মরণ করা হচ্ছে এলেম অনুযায়ী আমল করা। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি এলেমের অন্বেষণ বর্জন করে আমলে আত্মনিয়োগ করেছি। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক রেওয়ায়েত দ্বারা এলেম হয় না, বরং এলেম হচ্ছে খোদাভীতি। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যত ইচ্ছা এলেম শেখ, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ সওয়াব দেবেন না। কেননা, এলেম দ্বারা বোকাদের উদ্দেশ্য রেওয়ায়েত করা, আর আলেমদের উদ্দেশ্য নিজেদের পাহারা দেয়া। মালেক বলেন ঃ এলেম অর্জন করা ও তা ছড়িয়ে দেয়া উভয়ই ভাল, যদি নিয়ত ঠিক থাকে, কিন্তু যে বস্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সাথে থাকে তার উপর অন্য বস্তু অবলম্বন করো না। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমল করার জন্যে কোরআন নাযিল হয়েছে। তোমরা এর পাঠ ও পাঠ দানকেই আমল সাব্যস্ত করে নিয়েছ। সত্বরই কিছু লোক হবে, যারা একে বর্শার মত সোজা করবে। তারা ভাল লোক হবে না। যে আলেম আমল করে না সে রোগীর মত, যে ওষুধের গুণাগুণ বর্ণনা করে, অথবা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে সুস্বাদু খাদ্যের নাম উচ্চারণ করে কিন্তু নিজে তা পায় না। এরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ وَلَكُمُ

اَلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ যা বল তার কারণে। হাদীসে আছে– আমি আমার উম্মতের জন্যে যে বিষয়ের ভয় করি, তা হচ্ছে আলেমের পদস্খলন। কোরআনের বর্ণনা মতে আখেরাতের আলেমদের একটি আলামত, তাদের মনোযোগ এমন এলেমের দিকে থাকে, যা আখেরাতে কাজে আসে এবং এবাদতে উৎসাহ যোগায়। যেব্যক্তি আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে থাকে, সে সেই রোগীর মত, যে চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং চিকিৎসক কোথাও যাওয়ার জন্যে উদ্যত থাকে। সংকীর্ণ সময়ে রোগী চিকিৎসকের সাথে ওষুধের গুণাগুণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় মেতে উঠে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে না। এরূপ ব্যক্তির বোকামিতে কোন সন্দেহ আছে কি? রেওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল ঃ আমাকে কিছু এলেমের কথাবার্তা শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলাকে চিনেছ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে যাও। প্রথমে এসব বিষয়ে পাকাপোক্ত হও। এরপর তোমাকে নতুন নতুন বিষয়ও বলে দেব।

শাকীক বলখী (রহঃ)-এর শাগরেদ হাতেম আসামের মত শিক্ষা হওয়া উচিত। বর্ণিত আছে, একদিন শাকীক হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কতদিন ধরে আমার সাথে রয়েছ ? হাতেম বললেন ঃ তেত্রিশ বছর ধরে। শাকীক বললেন ঃ এ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কি শিখলে? হাতেম বললেন ঃ আমি আটটি মাসআলা শিক্ষা করেছি। শাকীক বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার সময় তোমার জন্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তুমি মাত্র আটটি বিষয় শিখলে ? হাতেম বললেন ঃ ওস্তাদ, আমি বেশী শিখিনি। মিথ্যা বলা আমি পছন্দ করি না। শাকীক বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো সে আটটি বিষয় কি, যা তুমি শিখেছ ? হাতেম বললেন ঃ প্রথম, আমি মানুষকে দেখলাম, প্রত্যেকের একটি প্রিয় বস্তু থাকে যা কবর পর্যন্ত তার সাথে থাকে। যখন সে কবরে পৌঁছে যায়, তখন সে প্রিয় বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাই আমি সৎকর্মকে আমার প্রিয় বস্তু সাব্যস্ত করেছি, যাতে আমি কবরে গেলে আমার প্রিয় বস্তুও আমার সাথে থাকে। শাকীক বললেন ঃ তুমি চমৎকার শিখেছ। এখন বাকী সাতটি বল। হাতেম বললেন ঃ দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছি ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى -

অর্থাৎ, "এবং কেউ তার পালনকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" আমি বুঝেছি, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যথার্থ। তাই আমি খেয়াল-খুশী দূর করার জন্যে নিজেকে শ্রমে নিযুক্ত করেছি। ফলে আমি আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

তৃতীয়, দুনিয়াতে দেখলাম, যার কাছে যে মূল্যবান বস্তু রয়েছে, তাকে সে হেফাযতে তুলে রাখে। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে দেখলাম– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা অবশিষ্ট থাকবে।"

এরপর মূল্যবান যা কিছু আমার হাতে এসেছে, তা আল্লাহর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে সেখানে মওজুদ থাকে।

চতুর্থ, আমি প্রত্যেক মানুষকে ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতি আকৃষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এসব বিষয়ে চিন্তা করে দেখলাম, এগুলো তুচ্ছ। এর পর আল্লাহ তা'আলার উক্তির দিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন– اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ -

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক পরহেযগারী অবলম্বন করেছে।

পঞ্চম, আমি মানুষকে দেখলাম, পরস্পরের প্রতি কুধারণা করে এবং একে অপরকে মন্দ বলে। এর কারণ হিংসা। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তি খোঁজ করে দেখলাম, তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا -

অর্থাৎ আমি মানুষের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন

করে দিয়েছি। তাই আমি হিংসা পরিত্যাগ করে মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমি জেনেছি, রুজির বন্টন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়। তাই আমি মানুষের সাথে শত্রুতা ত্যাগ করেছি।

ষষ্ঠ, আমি মানুষকে পারস্পরিক হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত দেখেছি। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۔

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তাকে দুশমনরূপে গ্রহণ কর। তাই আমি কেবল শয়তানকেই আমার শত্রু সাব্যস্ত করেছি এবং তার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার শত্রুতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি শয়তান ছাড়া অন্য সকল মানুষের শত্রুতা বর্জন করেছি।

সপ্তম, আমি মানুষকে দেখেছি, প্রত্যেকেই এক টুকরা রুটির আকাঙ্ক্ষী। এ ব্যাপারে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং অবৈধ কাজকর্মের দিকে পা বাড়ায়। এর পর আমি আল্লাহর এরশাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি। তিনি বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ۔

অর্থাৎ পৃথিবীস্থ পত্যেক প্রাণীর রিযিক আল্লাহর যিম্মায়। এতে আমি বুঝলাম, আমি আল্লাহ তা'আলার সেই প্রাণীদেরই একজন, যাদের রিযিক তাঁর যিম্মায়। তাই আমি এমন সব কাজে মশগুল হয়েছি, যা আমার যিম্মায় আল্লাহর হক এবং আল্লাহর যিম্মায় আমার যা হক, তার অন্বেষণ বর্জন করেছি।

অষ্টম, আমি প্রত্যেক মানুষকে দেখলাম, বিশেষ কিছুর উপর ভরসা করে। কেউ বিষয়সম্পত্তির উপর, কেউ ব্যবসায়ের উপর এবং কেউ নিজের স্বাস্থ্যের উপর ভরসা করে। এভাবে প্রত্যেক সৃষ্টি তার মতই আরেক সৃষ্টির উপর ভরসা করে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলাম।

তিনি বলেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তাই আমি আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করেছি। তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট।

শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন ঃ হে হাতেম! আল্লাহ তোমাকে তওফীক দিন। আমি তওরাত, ইনজীল, যবুর ও কোরআন পাকে চিন্তা করে সবগুলোর মূল এই আটটি বিষয়কে পেয়েছি। যে কেউ এ আটটি বিষয় অনুযায়ী আমল করবে, সে যেন এই আসমানী কিতাব চতুষ্টয় অনুযায়ীই আমল করবে। সারকথা, এ ধরনের এলেম উপলব্ধি করার ইচ্ছা আখেরাতের আলেমগণই করেন। দুনিয়াদার আলেমরা এমন এলেমে মশগুল হয়, যা থেকে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়; তারা সে এলেম ছেড়ে দেয়, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ আমি বুযুর্গগণকে দেখেছি, তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে পরহেযগারী ছাড়া অন্য কিছু শিখতেন না। আজকাল মানুষ কালাম শাস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু শেখে না।

আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা পানাহারের স্বাচ্ছন্দ্য, পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা এবং গৃহ ও আসবাবপত্রের সাজসজ্জার দিকে আকৃষ্ট হন না। বরং এসব ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেন। কারণ, এসব বিষয়ের আকর্ষণ যত কম হবে, ততই আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি এর প্রমাণ ঃ

হাতেম আসাম্মের শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হাতেমের সাথে রায় প্রদেশে গেলাম এবং আমাদের তিনশ' বিশ ব্যক্তির কাফেলা হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হল। সকলেই ছিল কম্বল পরিহিত। কারও কাছে খাদ্যের থলে ছিল না। আমরা এক সওদাগরের বাড়ীতে মেহমান হলাম। লোকটি খুব সামর্থ্যবান না হলেও অতিথিবৎসল ছিল। সে রাত্রে আমাদের আতিথেয়তা করল। সকালে সে হাতেমকে বলল ঃ আপনার কিছু প্রয়োজন থাকলে বলুন। কেননা, আমি একজন অসুস্থ ফেকাহ্‌বিদকে দেখতে যাব। তিনি বললেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ। আর ফেকাহ্‌বিদকে দেখতে যাওয়া তো এবাদত।

আমিও তোমার সাথে যাব। অসুস্থ ফেকাহ্‌বিদ ছিল রায়ের বিচারপতি মোহাম্মদ ইবনে মোকাতেল। আমরা যখন তাঁর ঘরের দরজায় পৌছলাম, তখন কুরসীবিশিষ্ট সুরম্য দরজা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম, একজন আলেমের দরজাও এমন হতে পারে! অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আমরা দেখলাম, বাসভবনটি সুবিস্তৃত, সুন্দর গালিচা বিছানো ও সুদৃশ্য পর্দা ঝুলানো। হাতেম আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। এরপর আমরা সেই স্থানে গেলাম, যেখানে বিচারপতি ছিলেন। সেখানে নরম গদি বিছানো ছিল এবং তার উপর বিচারপতি শায়িত ছিলেন। শিয়রের দিকে জনৈক গোলাম পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সওদাগর বিচারপতির শিয়রের দিকে বসে কুশল জিজ্ঞেস করল। হাতেম দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারপতি তাঁকে বসার জন্যে ইশারা করলে তিনি বললেন ঃ আমি বসব না। বিচারপতি শুধাল ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? হাতেম বললেন ঃ হাঁ, আমি একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই। বিচারপতি বললেন ঃ জিজ্ঞেস করুন। হাতেম বললেন ঃ আপনি উঠে বসলে জিজ্ঞেস করব। বিচারপতি উঠে বসলে হাতেম বললেন ঃ আপনি কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন? বিচারপতি বললেন ঃ বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণের কাছ থেকে, যাঁরা আমার সামনে হাদীস বর্ণনা কচ্ছেন। হাতেম শুধালেন ঃ তাঁরা কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ সাহাবায়ে করামের কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ সাহাবায়ে কেরাম কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। হাতেম বললেন ঃ যে এলেম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিবরাঈল, জিবরাঈলের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণ এবং তাঁদের কাছ থেকে আপনি লাভ করেছেন, তাতে আপনি কোথাও একথাও শুনেছেন কি যে, যেব্যক্তির ঘরে পরিচারক থাকে, স্বাচ্ছন্দ্য বেশী থাকে, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড়। বিচারপতি বলল ঃ না শুনিনি। হাতেম শুধালেন ঃ তা হলে কি শুনেছেন? বিচারপতি বলল ঃ শুনেছি, যেব্যক্তি সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে, মিসকীনদেরকে ভালবাসে এবং আখেরাতের জন্য সাজসরঞ্জাম

পূর্বেই পাঠিয়ে দেয়, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড় হবে। হাতেম বললেন ঃ তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অনুসরণ করছেন, না ফেরআউন ও নমরূদের অনুসরণ করছেন, যারা সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দিয়ে দালান তৈরী করেছিল? হে মন্দ আলেমগণ! আপনাদের মত লোকদেরকে দেখেই দুনিয়ালোভী মূর্খরা বলে, আলেমদের এ অবস্থা হলে তাদের অবস্থা কি এর চেয়েও খারাপ হবে না? একথা বলে হাতেম বিচারপতির কাছ থেকে চলে এলেন। বিচারপতি ইবনে মোকাতেলের অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। রায়ের লোকজন বিচারপতি ও হাতেমের এ কথোপকথনের কথা জানতে পেরে হাতেমকে বলল ঃ কাযভীনে তানাকেসী এই বিচারপতির চেয়েও অধিক জাঁকজমকপ্রিয়। হাতেম ইচ্ছা করেই তার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি একজন অনারব ব্যক্তি। আমি চাই, আপনি আমাকে ধর্মের সূচনা এবং নামাযের চাবি অর্থাৎ, ওযু শিখিয়ে দিন। তানাকেসী বলল ঃ খুব ভাল কথা। অতঃপর সে গোলামকে পানি আনতে বলল। গোলাম পানি নিয়ে এলে তানাকেসী বসে ওযু করল এবং তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করল। এরপর বলল ঃ এভাবে ওযু করা হয়। হাতেম বললেন ঃ আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন। আমিও ওযু করব, যাতে আমার পছন্দনীয় বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। অতঃপর হাতেম চার চার বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন। তানাকেসী বলল ঃ মিয়া সাহেব, আপনি পানির অপচয় করেছেন। কারণ, আপনি চার বার অঙ্গ ধৌত করেছেন। হাতেম বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, আমি এক অঞ্জলি পানির অপচয় করেছি, আর আপনি এত সব বিলাস সামগ্রী সঞ্চয়ের মধ্যে অপচয় করেননি? তানাকেসী টের পেয়ে গেল, ওযু শিক্ষা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না? বরং এ বিষয়টি প্রকাশ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ প্রশ্ন শুনে তানাকেসী গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত আর জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল না।

এর পর হাতেম বাগদাদে গেলে বাগদাদের অধিবাসীরা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আপনি একজন অনারব লোক– থেমে থেমে কথা বলেন, কিন্তু যে কেউ আপনার সাথে কথা বলে, আপনি তাকে জব্দ করে দেন। ব্যাপার কি? হাতেম বললেন ঃ আমার তিনটি অভ্যাস আছে, যার বদৌলত আমি প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হই। প্রথম,

যখন প্রতিপক্ষ হক কথা বলে, তখন আমি আনন্দিত হই। আর যখন সে ভুল কথা বলে তখন আমি দুঃখিত হই এবং নিজেকে সংযত রাখি। এ সংবাদ হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। লোকেরা তাঁকে হাতেমের কাছে নিয়ে এলে ইমাম আহমদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আবদুর রহমান! নিরাপত্তা কিসের মধ্যে? হাতেম বললেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! যে পর্যন্ত আপনার মধ্যে চারটি অভ্যাস সৃষ্টি না হবে, আপনি দুনিয়া থেকে নিরাপত্তা পাবেন না। প্রথম, মানুষ মূর্খতা প্রদর্শন করলে আপনি তাদেরকে মার্জনা করবেন। দ্বিতীয়, নিজের মূর্খতাকে তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। তৃতীয়, নিজের বস্তু তাদেরকে দেবেন। চতুর্থ, আপনি তাদের বস্তু আশা করবেন না। এরূপ হয়ে গেলে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন।

হাতেম মদীনা মুনাওয়ারায় গেলে সেখানকার লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আগমন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ মদীনা? উত্তরে বলা হল, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাসাদ কোথায়? আমি সেখানে নামায পড়ব। লোকেরা বলল ঃ তাঁর তো কোন প্রাসাদ ছিল না। তাঁর বাসগৃহ খুবই নিম্নস্তরের ছিল। হাতেম বললেন ঃ তাঁর সাহাবীগণের প্রাসাদই দেখিয়ে দাও। তারা বলল ঃ তাঁদেরও কোন প্রাসাদ ছিল না। তাঁদের বাসগৃহ ভূমি সংলগ্ন ছিল। হাতেম বললেন ঃ তাহলে এটা কি ফেরআউনের শহর? লোকেরা তাঁকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ এ অনারব লোকটি বলে, এটা ফেরআউনের শহর। শাসনকর্তা বলল, সে কেন এরূপ বলে? হাতেম বললেন ঃ তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি একজন অনারব মুসাফির। শহরে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মদীনা কার? তারা বলল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা। আমি বললাম ঃ তাঁর প্রাসাদ কোথায়? এভাবে পূর্ণ ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে হাতেম বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে।

এখন আমি জিজ্ঞেস করছি– আপনারা কার অনুসরণ করছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর না ফেরআউনের? ফেরাউন সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দ্বারা দালান নির্মাণ করেছে। শাসনকর্তা নিরুত্তর হয়ে হাতেমকে মুক্ত করে দিল।

সংসার নির্লিপ্ততা ও সাজসজ্জা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষীগণের আচার-অভ্যাস সম্পর্কে যথাস্থানে আরও বর্ণিত হবে। সুচিন্তিত অভিমত, বৈধ বিষয়-সম্পত্তি দ্বারা সাজসজ্জা করা হারাম নয়। কিন্তু তাতে সহজ থাকা তার প্রতি মহব্বতের কারণ হয়ে যায়। ফলে তা বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই হল সাবধানতা। কারণ, যেব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে নিশ্চিতই দুনিয়া থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি দুনিয়ার মধ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ থাকা যেত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া বর্জনের উপর এত জোর দিতেন না। এমনকি বর্ণিত আছে, نزع القميص المعلم তিনি ডোরাদার জামা খুলে ফেললেন। نزع خاتم الذهب فى اثناء الخطبة। তিনি খোতবার মাঝখানে স্বর্ণের আংটি খুলে ফেললেন। সংসার বর্জন সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক বিষয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ নওফলী হযরত মালেক ইবনে আনাসকে এই মর্মে পত্র লেখেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد فى الاولين والاخرين ـ

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মালেক ইবনে আনাসের প্রতি– হামদ ও সালামের পর– আমি শুনেছি, আপনি মিহিন বস্ত্র পরিধান করেন, পাতলা চাপাতি রুটি ভক্ষণ করেন, নরম শয্যায় উপবেশন করেন এবং দারোয়ান নিযুক্ত করেছেন। অথচ আপনি এলেমের আসনে সমাসীন। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সওয়ার হয়ে আপনার কাছে আসে। তারা আপনাকে নেতা বানিয়ে রেখেছে এবং আপনার কথা মান্য করে। অতএব আপনার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং বিনয় ও নম্রতা

নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেয়া। আমি উপদেশকল্পে এ পত্র লেখছি। এ খবর আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। ওয়াসসালাম। হযরত মালেক ইবনে আনাস এ পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم -

মালেক ইবনে আনাসের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদের প্রতি– আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার পত্র পেয়েছি এবং স্নেহ ও উপদেশে ধন্য হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাকওয়া দ্বারা লাভবান করুন এবং এ উপদেশের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দিন। আমিও আল্লাহ তাআলার কাছে তওফীক প্রার্থনা করছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর আনুগত্য করার সাধ্য কারও নেই। আপনি মিহিন বস্ত্র ও পাতলা চাপাতি রুটি ইত্যাদির কথা যা কিছু লেখেছেন, সবই সত্য। আমি বাস্তবে তাই করি এবং এজন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

অর্থাৎ কে হারাম করল আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি তার বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পাক পবিত্র খাদ্য বস্তুকে ?

আমি জানি, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম। আপনি আমার কাছে পত্র লেখা অব্যাহত রাখবেন। আমিও আপনার কাছে পত্র লেখা পরিহার করব না। ওয়াসসালাম।

দেখ, ইমাম মালেক কেমন অকপটে স্বীকার করে নিলেন, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জনই করা উত্তম। এগুলো যে মোবাহ বা বৈধ, তা-ও তিনি বলে দিলেন। বাস্তবে তাঁর উভয় উক্তিই সত্য। ইমাম মালেকের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এ ধরনের উপদেশের মধ্যে ইনসাফ ও স্বীকারোক্তি করতে পারেন, তবে তিনি বৈধ কাজের সীমানা জানতেও সক্ষম হবেন। ফলে তিনি বৈধ কাজ করে দ্বীনে শৈথিল্য, রিয়া ও

অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু অন্যান্য লোকদের এরূপ মনোবল নেই যে বৈধ কাজের সীমা লংঘন করবে না। কেননা, বৈধ কাজ দ্বারা আনন্দ লাভ করার মধ্যে বিপদাশংকা অনেক। এটা আল্লাহর ভয় থেকেও অনেক দূরে। যাঁরা আখেরাতের আলেম, তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয়ের দাবী হচ্ছে আশংকাব বিষয় থেকে দূরে থাকা। আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি আলামত শাসকবর্গ থেকে দূরে থাকা। যে পর্যন্ত আলাদা থাকা সম্ভব হবে, তাদের কাছে যাবে না; বরং তাদের সাক্ষাৎ থেকেও বেঁচে থাকবে, যদিও তারা স্বয়ং আলেমগণের কাছে আসে। কেননা, দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ। এর লাগাম শাসকবর্গের হাতে। যেব্যক্তি শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করে, তাকে কিছু না কিছু তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভ্রষ্টতার কাজ করতে হয়। অথচ তারা হয়ে থাকে জালেম। প্রত্যেক দ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদের জুলুম ও অন্যায় কর্মকান্ডের নিন্দা করা ওয়াজেব। যেব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, সে তাদের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে হেয় মনে করবে, অথবা তা অপছন্দ করার ব্যাপারে নীরব থাকবে। এটা হবে দ্বীনের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন। অথবা সে তাদের ক্রিয়াকর্ম বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে। এটা হবে প্রকাশ্য মিথ্যা। অথবা সে তাদের দুনিয়া থেকে কিছু লাভ করতে চাইবে। এটা হারাম। হালাল ও হারাম অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করব যে, শাসকবর্গের সম্পদ থেকে কোন্‌টি গ্রহণ করা জায়েয আর কোন্‌টি নাজায়েয– ভাতা হোক, পুরস্কার হোক অথবা জায়গীর ইত্যাদি হোক। সারকথা, শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করা সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। আখেরাতের আলেমগণের তরীকা হচ্ছে সাবধানতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

"যে জঙ্গলে থাকে, সে জুলুম করে। যে শিকারের পেছনে পড়ে সে গাফেল হয় এবং যে বাদশাহর কাছে যায়, সে ফেতনায় পতিত হয়।" তিনি আরো বলেন ঃ

সত্বরই তোমাদের উপর শাসকবর্গ নিযুক্ত হবে, যাদের কিছু কাজ ভাল হবে এবং কিছু হবে মন্দ। সুতরাং যেব্যক্তি তাদের সাথে পরিচিত হবে না, সে দোষমুক্ত থাকেবে, যে তাদেরকে খারাপ মনে করবে সে বেঁচে

যাবে। কিন্তু যেব্যক্তি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনুসরণ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। বলা হল ঃ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব না? তিনি বললেন– না। যতদিন তারা নামায পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো না।

সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ জাহান্নামে একটি জঙ্গল রয়েছে। তাতে সে আলেম থাকবে, যে বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। হুযায়ফা বলেন ঃ নিজেকে ফেতনার জায়গা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। জিজ্ঞেস করা হল ঃ ফেতনার জায়গা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা। তোমাদের কেউ যখন তাদের কাছে যায়, তখন মিথ্যা বিষয়ে তাদের প্রত্যয়ন করে এবং তার শানে এমন কথা বলে, বাস্তবে যা তার মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর আলেমগণ রসূলের আমানতদার, যে পর্যন্ত শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা না করে। যখন এরূপ করে, তখন তারা রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদেরকে ভয় কর এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। কেউ আ'মাশকে বলল ঃ আপনি এলেম জীবিত করে দিয়েছেন এ জন্যে যে, আপনার কাছে অনেক মানুষ এলেম শেখে। তিনি বললেন ঃ একটু সবর কর। যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের এক তৃতীয়াংশ পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই মরে যায়, এক তৃতীয়াংশ শাসকবর্গের দরজার সাথে চিমটে থাকে। তারা সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কম লোকই সাফল্য অর্জন করে। এ কারণেই সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন ঃ যখন আলেমকে দেখ, সে শাসকবর্গকে ঘিরে রয়েছে, তখন তার কাছ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, সে চোর। আওযায়ী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সে আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নেই, যে শাসনকর্তার কাছে যায়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সর্বনিকৃষ্ট আলেম সে, যে শাসকদের কাছে যায় এবং সর্বোত্তম শাসক সে যে আলেমদের কাছে যায়। মকহুল দামেশকী বলেন ঃ যেব্যক্তি কোরআন শেখে এবং দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, এরপর খোশামোদ ও লোভের পথে শাসনকর্তার সংসর্গ অবলম্বন করে, সে পদে পদে দোযখের অগ্নিতে প্রবেশ করে। সামনুন বলেন ঃ আলেমের জন্যে এটা খুবই মন্দ কথা যে, কেউ তার মজলিসে এসে শুনে, সে শাসনকর্তার কাছে চলে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমি বুযুর্গদের এই উক্তি শুনেছি, যখন আলেমকে দুনিয়াপ্রেমিক দেখ, তখন তাকে দ্বীনের

ব্যাপারে দোষী মনে করো। আমি এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি শাসনকর্তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে আত্মসমালোচনা করে দেখেছি, এলেম থেকে আমি অনেক দূরে সরে পড়েছি। অথচ আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাসকদের সাথে মেলামেশা করি, তা তোমরা দেখ ও জান। আমি কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করি এবং প্রায়ই তাদের খাহেশের বিরোধিতা করি। আমি তাদের কাছে যতদূর সম্ভব না যাওয়ারই চেষ্টা করি। এছাড়া আমি তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি না এবং তাদের ঘরের পানি পর্যন্ত পান করি না। এরপর তিনি বলেন ঃ আমাদের যুগের আলেমরা বনী ইসরাঈলের আলেমদের চেয়েও অধম। তারা বাদশাহদেরকে বৈধ বিষয়াদি বলে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী কথাবার্তা শুনায়। অথচ যেসব কথাবার্তা বলা তাদের উপর ওয়াজেব, সেগুলো শুনালে শাসকরা তাদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের কাছে যাওয়া পছন্দ করবে না। যদিও এটা আল্লাহর কাছে তাদের নাজাতের ওসিলা হতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গপ্রাপ্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের ভাষায় ইনি ছিলেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)। হাসান বলেন ঃ তিনি শাসকবর্গের কাছে যেতেন না; বরং তাদেরকে ঘৃণা করতেন। তাঁর ছেলেরা তাঁকে বলল ঃ যারা ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভে আপনার সমান নয়, তারা শাসকবর্গের কাছে যায়। যদি আপনিও যেতেন তবে আমাদের জন্যে তা কল্যাণকর হত। তিনি বলেন ঃ বৎসগণ! দুনিয়া মৃত। কিছু লোক একে ঘিরে রেখেছে। আল্লাহর কসম, আমি যথাসম্ভব তাদের সাথে শরীক হবো না। ছেলেরা বলল ঃ তা হলে আপনি জীর্ণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ আমি ঈমানের সাথে জীর্ণ অবস্থায় মরে যাওয়াকে মোনাফেকীর মাধ্যমে বিত্তশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা উত্তম মনে করি। হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি ছেলেদেরকে হারিয়ে দিলেন এবং চমৎকার প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। কারণ, তিনি জেনে নিয়েছেন, মাটি মাংস ও মদ খেয়ে ফেলবে, কিন্তু ঈমান খাবে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শাসকদের কাছে গেলে মানুষ নিশ্চিতই মোনাফেকী থেকে বাঁচতে পারে না, যা ঈমানের পরিপন্থী।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) সালমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে সালমা! শাসকবর্গের দরজায় যেয়ো না। কারণ, তুমি তাদের দুনিয়া থেকে তখনই কিছু অংশ পাবে, যখন তারা তোমার দ্বীন থেকে উৎকৃষ্ট অংশটি নিয়ে নেবে।

এ বিষয়টি আলেমদের জন্যে একটি বড় ফেতনা এবং তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। বিশেষতঃ এমন আলেমদের বিরুদ্ধে, যাদের কণ্ঠস্বর ভাল এবং কথাবার্তা সুমিষ্ট। শয়তান তাদেরকে একথাই বুঝায় যে, শাসকবর্গের কাছে গেলে এবং তাদেরকে উপদেশ দিলে তারা জুলুম থেকে বিরত থাকবে, শরীয়তের বিধি-বিধান তাদের মধ্যে জারি ও কায়েম হয়ে যাবে। শয়তান ক্রমান্বয়ে তাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, শাসকদের কাছে যাওয়া ধর্মীয় কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এরপর যখন আলেম তাদের কাছে যায়, তখন নম্র ভাষা ব্যবহার ও ধর্মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন না করে পারে না। তাদের তারীফ ও খোশামোদ না করেও পারে না। এতে দ্বীনের ক্ষতি হয়।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলতেন, আলেমগণ যখন জানতেন, তখন আমল করতেন, আমলে মশগুল হওয়ার পর অজ্ঞাত হতেন, অজ্ঞাত হওয়ার পর তাদের অন্বেষণ হত এবং অন্বেষণ হওয়ার পর তাঁরা পালিয়ে ফিরতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হযরত হাসান বসরীকে এই মর্মে চিঠি লেখলেন ঃ হামদ ও সালাতের পর নিবেদন, আপনি আমাকে এমন লোকদের সন্ধান দিন, যাঁদের কাছ থেকে আমি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারাদিতে সাহায্য নিতে পারি। তিনি জওয়াবে লেখলেন ঃ দ্বীনদাররা তো আপনার কাছে যাবার নয়। দুনিয়াদার আপনার কাম্য নয়। কাজেই আপনি অভিজাত ব্যক্তিবর্গকে সাথে রাখুন। তারা তাদের আভিজাত্য বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনা থেকে হেফাযতে রাখে। এ পত্র ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে লেখা হয়েছিল, যিনি সমকালীন যুগের সর্বাধিক সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। অতএব, এমন শাসকের কাছ থেকে দ্বীনদারদের দূরে থাকা শর্ত হলে, অন্যান্য শাসকের সাথে মেলামেশা করা কেমন করে ঠিক হবে!

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া করে ফতোয়া না দেয়া, বরং যে পর্যন্ত ফতোয়া দেয়া থেকে

বেঁচে থাকার উপায় জানা থাকে, সে পর্যন্ত বেঁচে থাকা। সুতরাং কেউ যদি কোন আলেমকে এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করে, যার বিধান সে কোরআন অথবা অকাট্য হাদীস অথবা ইজমা অথবা জাহেরী কিয়াস থেকে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে বিধান বলে দেবে। আর যদি এমন প্রশ্ন করে, যাতে সন্দেহ হয়, তবে বলে দেবে– আমি জানি না। যদি এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, যার বিধান আলেম ব্যক্তির ইজতিহাদ ও অনুমান দ্বারা সঠিক জানা রয়েছে, তবে এতে সাবধানতা অবলম্বন করবে, বরং অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতে বলবে, যদি অন্য ব্যক্তি ঠিক ঠিক বলতে পারে। এটাই সাবধানতা। কেননা, ইজতিহাদের বিপদাশংকা নিজের ঘাড়ে রাখা গুরুতর ব্যাপার। হাদীসে বলা হয়েছে–

এলেম তিন প্রকার–(১) বিধান ব্যক্তকারী কোরআন, (২) প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং (৩) আমি জানি না। শা'বী বলেন ঃ আমি জানি না হচ্ছে অর্ধেক এলেম। যেব্যক্তি না জানার ক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ থাকে, তার সওয়াব সে ব্যক্তি থেকে কম নয়, যে সঠিক জওয়াব বলে দেয়। কারণ, না জানার কথা স্বীকার করা নফসের জন্যে খুবই কঠিন। মোট কথা, এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও মনীষীগণের রীতি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ অমুক শাসকের কাছে যাও, সে এ ধরনের বিষয়াদির যিম্মাদার। এ মাসআলা তার ঘাড়ে রেখে দাও।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে প্রত্যেক মাসআলায় ফতোয়া দেয়, সে উন্মাদ। তিনি আরও বলেন ঃ এলেমের ঢাল হচ্ছে আমি জানি না। এটি বিস্মৃত হলে কল্যাণ নেই।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানের জন্যে সে আলেমের চেয়ে কঠিন কেউ নেই, যে এলেম সহকারে বলে এবং এলেম সহকারে চুপ থাকে। শয়তান বলে, তাকে দেখ, তার বলার চেয়ে তার চুপ থাকা আমার উপর বেশ কঠিন। জনৈক বুযুর্গ আবদালের এই গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর খাদ্য হল উপবাস এবং যে পর্যন্ত তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, সে পর্যন্ত তিনি কথা বলেন না। কারও জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়ার লোক থাকলে তিনি চুপ থাকেন। বাধ্য হলে নিজে জওয়াব দেন। জিজ্ঞাসার পূর্বে বলাকে তিনি কথা বলার গোপন অভিলাষ বলে মনে করেন।

হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গেলেন। লোকটি তখন বক্তৃতা করছিল। তারা বললেন ঃ সে যেন বলছে– আমাকে জেনে নাও। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি আলেম, যাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে সে মনে করে যেন তার চোয়াল টেনে বের করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে পুল বানিয়ে দোযখ অতিক্রম করতে চাও। আবু জাফর নিশাপুরী বলেন ঃ আলেম সে ব্যক্তি, যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে ভয় করে যে, কেয়ামতে এ প্রশ্ন যেন না উঠে, জওয়াব কোথা থেকে দিয়েছিলে ? ইবরাহীম তায়মীকে কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁদতেন এবং বলতেন ঃ তুমি আর কাউকে পেলে না, আমার উপর চড়াও হলে ? আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখয়ী, ইবরাহীম আদহাম ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ) দুই অথবা তিন ব্যক্তির সামনে কিছু বর্ণনা করতেন। বেশী লোক জমায়েত হয়ে গেলে নীরব থাকতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

আমি জানি না, ওযায়র নবী কিনা, আমি জানি না ইয়ামন সম্রাট তুব্বা অভিশপ্ত কিনা। আমি এটাও জানি না যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন কিনা ? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল, উত্তম জায়গা এবং সর্বনিকৃষ্ট জায়গা কোন্‌টি ? তখন তিনি বললেন ঃ আমি জানি না। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলে তিনি তাঁকে এ প্রশ্ন করলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ আমি জানি না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ সর্বোত্তম জায়গা মসজিদ আর সর্বনিকৃষ্ট জায়গা বাজার। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে কেউ দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি একটির জওয়াব দিতেন এবং নয়টির ব্যাপারে নীরব থাকতেন। আর হযরত ইবনে মসউদ নয়টির জওয়াব দিতেন এবং একটির জওয়াবে নীরব থাকতেন। পূর্ববর্তী ফেকাহবিদদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা বলে দিতেন ঃ আমি জানি না। জানি বলার লোক খুব কম ছিল। সুফিয়ান সওরী, মালেক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বল, ফোযায়ল ইবনে আয়ায ও বিশর ইবনে হারেস প্রমুখ ফেকাহবিদ এমনি ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই জানি না বলতেন।

আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রঃ) বলেন ঃ আমি এই মসজিদে একশ' বিশ জন সাহাবী দেখেছি। তাঁদের কারও কাছে কোন

প্রশ্ন উপস্থিত হলে তাঁরা তা অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং অন্যজন তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রশ্নটি আবার প্রথম জনের জাছে ফিরে আসত। বর্ণিত আছে, আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে একজনের কাছে একটি ভাজা করা ছাগল হাদিয়াস্বরূপ পাঠানো হয়। তাঁরা তখন খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি ছাগলটি অন্য একজনের কাছে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের কাছে হাদিয়া প্রেরণ করলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে আবার প্রথম সাহাবীর কাছে ফিরে এল। এখন চিন্তা কর, আমাদের যুগে আলেমদের অবস্থা কেমন পাল্টে গেছে ? পূর্ববর্তীগণ যে বিষয় থেকে পালাতেন, আজ তাই কাম্য হয়ে গেছে এবং পূর্বে যা কাম্য ছিল, আজ তা ঘৃণার বস্তু হয়ে গেছে। ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব থেকে বেঁচে থাকার কথা এ হাদীস থেকেও জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তিন প্রকার ব্যক্তিই ফতোয়া দিবে– শাসক, শাসিত অথবা যে নিজেকে মুফতীরূপে প্রকাশ করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম চারটি বিষয় একে অপরের কাছে সমর্পণ করতেন– নামাযের ইমামত, ওসিয়ত, আমানত ও ফতোয়া। কেউ কেউ বলেন ঃ যার এলেম-কালাম কম হত, সে তড়িঘড়ি ফতোয়া দিতে প্রস্তুত হয়ে যেত। আর যে বেশী পরহেযগার হত, সে ফতোয়াকে বেশী পরিমাণে অপরের কাছে সমর্পণ করত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ পাঁচটি বিষয়ে মশগুল থাকতেন– কোরআন তেলাওয়াত, মসজিদ আবাদকরণ, আল্লাহর যিকির, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। এর কারণ তাঁরা হাদীসে শুনেছিলেন ঃ

মানুষের প্রত্যেকটি কথা তার জন্যে ক্ষতিকর– মঙ্গলজনক নয়, তিনটি কথা ব্যতীত– (১) সৎকাজে আদেশ (২) অসৎ কাজে নিষেধ এবং (৩) আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ তাদের অনেক পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই, কিন্তু যে খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির আদেশ করে। জনৈক আলেম ইজতিহাদকারী ও ফতোয়াদাতাদের মধ্য থেকে একজনকে স্বপ্নে দেখে

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি যে ফতোয়া দিতেন এবং ইজতিহাদ করতেন, তার অবস্থা কিরূপ পেলেন ? জওয়াবে সে নাক সিঁটকিয়ে ও মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ আমি এর কোন মর্যাদা পাইনি এবং এর পরিণাম ভাল হয়নি। ইবনে হাসীন বলেন ঃ আলেমরা এমন প্রশ্নের জওয়াব বলে দেয়, যা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি সকল বসরী সাহাবীকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

মোট কথা, নীরব থাকা আলেমগণের একটি চিরন্তন রীতি ছিল। তাঁরা প্রয়োজন ব্যতীত কখনও কথা বলতেন না। হাদীসে আছে– তোমরা যখন কাউকে নীরবতা পালনকারী ও সংসারের প্রতি অনাসক্ত দেখ, তখন তার কাছে যাও। কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেম দু'প্রকার। এক, জনসাধারণের আলেম, সে মুফতী। এ ধরনের আলেম বাদশাহদের মোসাহেব হয়ে থাকে! দুই– বিশিষ্টদের আলেম। তাঁরা তওহীদ ও অন্তরের ক্রিয়াকর্মের আলেম। তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও একা থাকেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ যখন এলেম বেশী হয়, তখন কথা কমে যায় আর যখন কথা বেশী হয় তখন এলেম কমে যায়। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর কাছে এক পত্র লেখেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পত্রের মর্ম ছিল এই ঃ ভাই, আমি শুনেছি মানুষ আপনাকে চিকিৎসকের আসনে বসিয়েছে। আপনি রোগীদের চিকিৎসা করেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি আপনি বাস্তবিকই চিকিৎসক হন, তবে কথা বলবেন। কারণ, আপনার কথা রোগমুক্তি। আর যদি আপনি চিকিৎসক সেজে থাকুন, তবে ভাই আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুসলমানকে প্রাণে মারবেন না। এ পত্র পাওয়ার পর হযরত আবুদ্দারদাকে কেউ ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছু বলতেন না। হযরত আনাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ আমাদের নেতা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-কে প্রশ্ন কর। হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ জাবের ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস কর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে দেখিয়ে দিতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী হযরত হাসান বসরীর সামনে বিশটি হাদীস বর্ণনা করলেন। কেউ এগুলোর তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রেওয়ায়েত ছাড়া কিছুই জানি না। এরপর হাসান বসরী রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এক একটি

হাদীসের আলাদা তফসীর করলেন। শ্রোতারা তাঁর তফসীর ও স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ হল। বর্ণনাকারী সাহাবী এক মুঠি কংকর তুলে তাঁদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমরা আমাকে এলেমের কথা জিজ্ঞেস কর, অথচ তোমাদের এখানে এমন আলেম বিদ্যমান রয়েছে।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, তারা এলমে বাতেন শিক্ষা করা, অন্তরের দেখাশুনা করা, আখেরাতের পথ চেনা ও তাতে চলার প্রতি অধিক যত্নবান থাকেন এবং মোজাহাদা ও মোরাকাবা দ্বারা এসব বিষয়ের স্বরূপ জানার সত্যিকার আগ্রহ পোষণ করেন। কেননা, মোজাহাদা থেকে মোশাহাদা এবং অন্তর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়। এর পর এ থেকে অন্তরে প্রজ্ঞার ঝরণা প্রবাহিত হয়– শুধু কিতাবী শিক্ষা এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। বরং মানুষ যদি মোজাহাদা করে, অন্তরের দেখাশুনা করে, যাহেরী ও বাতেনী আমল করতে থাকে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত মন ও স্বচ্ছ চিন্তা নিয়ে বসে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়, তবে অপরিমিত ও অসীম প্রজ্ঞার আলোতে তার অন্তর খুলে যায়। এসব বিষয়ই হচ্ছে এলহামের চাবি ও কাশফের উৎস। অনেক শিক্ষার্থী বহু দিন পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু যতটুকু শুনেছিল, তা থেকে এক অক্ষরও অগ্রসর হতে পারে না। আর অনেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় এলেম হাসিল করে আমল ও অন্তরের দেখাশুনার প্রতি যেই মনোনিবেশ করে, অমনি আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা তার জন্যে খুলে দেন, যা দেখে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে সে বিষয়েরও এলেম দান করেন, যা সে শেখেনি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে– হে বনী ইসরাঈল! একথা বলো না যে, এলেম আকাশে রয়েছে, তাকে কে নামাবে ? অথবা এলেম ভূগর্ভে রয়েছে, তাকে কে উপরে উঠাবে ? অথবা এলেম সমুদ্রের উপরে রয়েছে, তাকে এপারে কে আনবে ? এলেম তো তোমাদের অন্তরে রক্ষিত। তোমরা আমার সামনে আধ্যাত্মবিদদের ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শন কর এবং সিদ্দীকদের চরিত্র অবলম্বন কর। আমি তোমাদের অন্তরে সে এলেম প্রকাশ করে দেব, যা তোমাদেরকে আবৃত করে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী বলেন ঃ আলেম আবেদ, যাহেদ সকলেই দুনিয়া থেকে গেছেন এবং তাদের অন্তর তালাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু সিদ্দীক ও শহীদদের

অন্তর রয়েছে খোলা। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন–

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ আল্লাহর কাছেই অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতীত কেউ এ চাবির খবর রাখে না। যদি দিলওয়ালাদের দিলের উপলব্ধি বাতেনের নূরের মাধ্যমে এলমে যাহেরের উপর প্রবল না হত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলতেন না ঃ তুমি নিজের মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

বান্দা নিরন্তর নফল এবাদত দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে বন্ধু করে নেই। আমি যখন তাকে বন্ধু করে নেই তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে শুনে-------। কেননা, কোরআন মজীদের অনেক গোপন রহস্য যিকির ফিকিরে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির অন্তরে এসে যায়। এসব রহস্য তফসীরে কোথাও থাকে না এবং তফসীরবিদদেরও জানা থাকে না। কেবল সে ব্যক্তিরই জানা থাকে, যে মারেফত লাভের ইচ্ছায় আপন অন্তরের পরিচর্যা করে। এসব রহস্যবিদদের সামনে পেশ করা হলে তাঁরাও এগুলোকে ভাল বলে এবং তাঁরাও জানতে পারে যে, এ আলো স্বচ্ছ অন্তরের এবং আল্লাহ তা'আলার কৃপার। এলমে মোকাশাফা ও এলমে মোআমালার অবস্থাও তেমনি। এসব এলেমের প্রত্যেকটি যেন এক অতল সমুদ্র। প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী তার অংশ অনুযায়ী এবং ভাল আমলের তওফীক অনুযায়ী এতে অবগাহন করতে সমর্থ হয়। এ ধরনের আলেমগণের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে বলেন ঃ মানুষের অন্তর একটি পাত্র বিশেষ– যে অন্তরে কল্যাণ বেশী, তাই উত্তম। মানুষ তিন প্রকার ঃ এক– আলেমে রব্বানী, দুই– যে মুক্তির জন্যে এলেম অর্জন করে। সে নিম্নস্তরের বোকা। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, বোকারা প্রত্যেক মিথ্যার প্রতি আহ্বানকারীর অনুসারী হয়ে যায়। এরা কোন এলেমের নূর থেকে আলো লাভ করে মজবুত বিষয়ের আশ্রয় নেয় না। এলেম ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। এলেম তোমার হেফাযত করে, আর তুমি ধন-সম্পদের হেফাযত কর। এলেম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পদ ব্যয় করলে হ্রাস পায়। এলেমের মহব্বত একটি গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যদ্দ্বারা জীবনে আনুগত্য অর্জিত হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম ব্যবহার পাওয়ার উপায়। এলেম শাসক এবং

ধন-সম্পদ শাসিত। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার উপকারিতা দূর হয়ে যায়। যারা ধনী ছিল এবং দল বলের অধিকারী ছিল, তারা সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আলেমগণ মহাকালের অন্ত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। এর পর হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এখানে অনেক এলেম আছে, যদি এগুলো আয়ত্তকারী পাওয়া যায়। আমি আপদমুক্ত শিক্ষার্থী পাই না। এমন পাই যারা দ্বীনের হাতিয়ারকে দুনিয়া অন্বেষণে ব্যবহার করে, আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা তাঁর ওলীদের প্রতি কটূক্তি করে এবং আল্লাহর প্রমাণ নিয়ে তার সৃষ্টিকে দাবিয়ে রাখে। অথবা এমন পাই, যারা সত্যপন্থীদের অনুগত কিন্তু প্রথম সন্দেহ থেকেই তাদের অন্তরে সংশয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জেনে রাখ, বাতেনের বোঝা এরাও বহন করতে পারে না, বরং এরা লোভী, খায়েশের দাস, অর্থলিপ্সু এবং প্রবৃত্তির অনুসারী । চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে এদের মিল রয়েছে। ইলাহী, যখন এলেম আয়ত্তকারীরা মরে যাবে, যারা আল্লাহর নিদর্শনকে আল্লাহর উদ্দেশেই কায়েম করবে। তাঁরা হয় প্রকাশ্যে থাকবে, না হয় আত্মগোপনকারী ও পরাভূত হয়ে থাকবেন, যাতে আল্লাহর নিদর্শনসমুহ অকেজো হয়ে না যায়। তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং মর্যাদায় অধিক হবে। তাঁদের অস্তিত্ব বাহ্যতঃ নিরুদ্দেশ এবং তাঁদের চিত্র অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তাঁআলা তাদের মাধ্যমে আপন নিদর্শনসমূহের হেফাজত করবেন, যাতে তাঁরা এসব নিদর্শনকে তাঁদের মত লোকদের কাছে সমর্পণ করে এবং তাঁদের অন্তরে সেগুলো বপন করে দিতে পারেন। এলেম তাঁদেরকে বস্তুর স্বরূপ ও বিশ্বাসের গভীরে পৌঁছে দেয়। ধনীরা যে বিষয়কে কঠিন মনে করে, তা তাঁদের কাছে সহজ। গাফেলরা যে বিষয়ে আতংকিত হয়, তাঁরা তা দ্বারা মনোরঞ্জন করেন। সৃষ্টির মধ্যে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ওলী ও আমানতদার ; তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বায়ক এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সম্রাট। এরপর হযরত আলী (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আমি তাঁদের দীদারের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তাঁর বর্ণিত শেষোক্ত বিষয়বস্তু আখেরাতের আলেমগণের বিশেষণ। অধিক আমল ও অধিক মোজাহাদা দ্বারা এই এলেম অর্জিত হয়।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া। কেননা, বিশ্বাস দ্বীনের মূলধন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

বিশ্বাস হচ্ছে পূর্ণ ঈমান। অতএব এলমে একীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। অর্থাৎ, বিশ্বাসের সূচনা জানতে হবে। এরপর এটি অর্জনের পন্থা অন্তরের জন্যে আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে যাবে। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বিশ্বাস অর্জন কর। এর অর্থ, বিশ্বাসী লোকদের কাছে বস, তাঁদের কাছে বিশ্বাসের এলেম শ্রবণ কর এবং প্রতিনিয়ত তাঁদের অনুগামী হও, যাতে তোমার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, যেমন তাঁদের বিশ্বাস শক্তিশালী। কেননা, অল্প বিশ্বাস অনেক আমলের তুলনায় উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে বর্ণনা করা হল, এক ব্যক্তির বিশ্বাস ভাল, কিন্তু সে অনেক গোনাহ করে। অন্য এক ব্যক্তি এবাদতে খুব মেহনত করে, কিন্তু বিশ্বাস কম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কোন লোক নেই, যার গোনাহ নেই। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি যার মজ্জা এবং বিশ্বাস যার অভ্যাস, গোনাহ তার ক্ষতি করে না। কেননা, যখন গোনাহ করে তখন তওবা এস্তেগফার করে এবং অনুতপ্ত হয়। ফলে তা গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে কিছু অতিরিক্ত হয়, যদ্দ্বারা সে জান্নাতে যায়। এজন্য রসূল করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে বস্তু তোমাদেরকে পরিমিত দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্বাস ও সবর । যেব্যক্তি এ উভয়টি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, সে যদি রাত্রি জাগরণ ও দিনের রোযা কখনও না করে, তবু তার ভয়ের কারণ নেই।

লোকমান (রহঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন ঃ বৎস! বিশ্বাস ছাড়া আমল করার সাধ্য হয় না। মানুষ ততটুকুই করে যতটুকু সে বিশ্বাস করে। আমলকারীর বিশ্বাস কম না হওয়া পর্যন্ত সে আমলে ক্রটি করে না।

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (রাঃ) বলেন ঃ তওহীদ একটি নূর, আর শেরক একটি আগুন। শেরকের আগুন দ্বারা মুশরিকদের যত সৎকর্ম জ্বলে পুড়ে যায় । অপরপক্ষে তওহীদের নূর দ্বারা তওহীদপন্থীদের তার চেয়ে বেশী গোনাহ্ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়। এখানে নূরের অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় "মুকিনীন" তথা বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিশ্বাস সৎকর্ম ও সৌভাগ্যের উপায়।

এখন প্রশ্ন হয়, বিশ্বাসের অর্থ কি? এর শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার উদ্দেশ্য কি? এটা না বুঝা পর্যন্ত বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের

জওয়াব হচ্ছে, দুই শ্রেণীর লোক একীন তথা বিশ্বাস শব্দটিকে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহার করে। এক– মোনাযারা ও কালামশাস্ত্রীদের পরিভাষা। তারা বলে ঃ একীন অর্থ সন্দেহ না হওয়া। কারণ, কোন কিছুকে সত্য বলে জানার চারটি স্তর রয়েছে– (১) সত্য বলে জানা ও মিথ্যা বলে জানা সমান সমান। একে সন্দেহ বলে। উদাহরণতঃ তোমাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন কি দেবেন না? ব্যক্তিটির অবস্থা তোমার জানা নেই। এমতাবস্থায় তুমি হাঁ অথবা না কিছুই বলবে না; বরং উভয় বিষয়ের সম্ভাব্যতা তোমার কাছে সমান হবে। একে বলা হয় সন্দেহ। (২) তোমার মন সত্য ও মিথ্যা উভয় দিকের মধ্য থেকে এক দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং তুমি এটাও জানবে যে, অপর দিকটিও হতে পারে; কিন্তু তার হওয়া প্রথম দিক অগ্রাধিকার দেয়ার পরিপন্থী নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে তুমি সৎ ও মুত্তাকী বলে জান। তার অবস্থা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে এই অবস্থায় মরে গেলে তার আযাব হবে কি হবে না? এ ক্ষেত্রে তোমার মন তার আযাব না হওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকবে। কারণ, তার ভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তুমি আযাব হওয়ারও কোন কারণ তার অভ্যন্তরে ধরে নিতে পার। এ ধরে নেয়া প্রথম বিশ্বাসের সাথে জড়িত। এ ধরনের বিশ্বাসকে বলা হয় "যন" (ধারণা)। (৩) কোন বিষয়ের সত্যতা মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তার বিরপীতটা মনে উদয়ই হয় না এবং হলেও মন তা মেনে নিতে সম্মত হয় না। কিন্তু এ সত্যায়ন সত্যিকার মারেফত সহকারে না থাকা। অর্থাৎ, যদি খুব চিন্তা করা হয় এবং বিপরীতটির সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, তবে তা সম্ভবপর হওয়ার অবকাশ অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। এ সত্যায়নকে একীনের কাছাকাছি বিশ্বাস বলা হয়। শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের হয়ে থাকে। কেবল শুনে শুনেই তা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এমনি প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী তার মাযহাবের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করে এবং মনে করে, তার ইমামই সঠিক। যদি কেউ বলে, তোমার ইমাম ভুলও করতে পারেন, তবে সে তা মানতে রাযী হয় না। (৪) সত্যিকার মারেফতের স্তর, যা প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। এতে নিজেরও সন্দেহ থাকে না, অপরকেও সন্দেহে ফেলার কল্পনা করা যায় না। মোনাযারা ও কালামশাস্ত্রীদের কাছে এটাই একীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস। এ পরিভাষা

অনুযায়ী একীন শক্তিশালী ও দুর্বল হতে পারে না। কেননা, সন্দেহাতীত হওয়া সবল বা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা দূর করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিভাষা ফেকাহবিদ, সূফী ও অধিকাংশ আলেমের। তাঁদের মতে, যার মধ্যে ধারণা ও সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, তাই একীন। এতে অন্তরে প্রবল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। ফলে একথা বলা যায়, মৃত্যুর উপর অমুক ব্যক্তির একীন দুর্বল। অথবা সে মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ করে না। অথবা এরূপ বলা যায়, রুজি পৌঁছার উপর অমুক ব্যক্তির একীন শক্তিশালী। অথচ মাঝে মাঝে তার রুজি না পাওয়াও সম্ভব। সারকথা, মন যখন কোন বিষয়কে সত্য বলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এটা তার মনে এমনভাবে প্রবল হয়ে যায় যে, মনের উপর তারই রাজত্ব চলে এবং তারই দিক থেকে ভাল কাজের আগ্রহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা হয়, তখন এ অবস্থাকে একীন বলা হয়। এখন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী মৃত্যুর ব্যাপারে সকলের একীন সমান। অর্থাৎ, এতে কারও কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী একীন সকলের নেই। কেননা, কিছু লোক রয়েছে যারা কোন্ সময় মৃত্যুর কথা চিন্তাই করে না এবং তার প্রস্তুতিও নেয় না। মনে হয়, তাদের মৃত্যুর একীন নেই। পক্ষান্তরে কিছু লোকের মনকে এই একীন এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তারা তাদের সমগ্র শক্তি এর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করে রেখেছে; এর মধ্যে বিপরীত দিকটির কোন অবকাশই রাখেনি। এরূপ একীনকে শক্তিশালী একীন বলা হয়। এ প্রসঙ্গেই কোন মনীষী বলেছেন ঃ যে একীনে কোন সন্দেহ নেই, অথচ তা সেই সন্দেহের অনুরূপ যাতে কোন একীন নেই, তা মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু বলে আমার মনে হয় না।

আমরা আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেছি যে, তারা বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোযোগী হন। এতে আমাদের উদ্দেশ্য উভয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশ্বাস। অর্থাৎ, প্রথমে সন্দেহ দূর হওয়া, অতঃপর মনের উপর বিশ্বাস এমন প্রবল হওয়া যে, তারই আদেশ কার্যকর হয়। এটা জানার পর তুমি একথার উদ্দেশ্যও জানতে পারবে যে, একীন তিন প্রকার– (১) একীনের শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া, (২) একীনের কম ও বেশী হওয়া এবং (৩) একীনের প্রকাশ্য ও গোপন হওয়া।

দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া হচ্ছে, মনের উপর তার প্রাবল্য কেমন? এতে একীনের অশেষ অসংখ্য স্তর রয়েছে। মৃত্যুর প্রস্তুতিতে এসব স্তরের পার্থক্য অনুযায়ী মানুষও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। একীন যে প্রকাশ্য ও গোপন হয়, তাও অস্বীকার করা যায় না। আর একীন যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, সেগুলো কম বেশী হওয়ার কারণে একীনও কম বেশী হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– অমুক ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী আলেম। অর্থাৎ, তার জানা বিষয়াদি বেশী। এজন্যই আলেম কখনও শরীয়তের সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী একীন রাখে এবং কখনও কতক বিষয়ের উপর একীন রাখে।

এখন একীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি এবং কোন্ কোন্ কিষয়ে একীন কাম্য তা জানা দরকার। প্রকাশ থাকে যে, পয়গম্বরগণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, সেগুলো সবই একীনের স্থান। অতএব বুঝা যায়, এগুলো গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা এখানে কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তওহীদ। অর্থাৎ, সকল বস্তুকে সকল কারণের মূল কারণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনে করতে হবে এবং মধ্যবর্তী কারণসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না; বরং মধ্যবর্তী কারণসমূহকে আল্লাহর অনুগত মানতে হবে– তাদের কোন প্রভাব স্বীকার করা যাবে না। যেব্যক্তি এসব বিষয়কে সত্য জ্ঞান করবে, তাকে তওহীদপন্থী বলা হবে। সত্য জ্ঞান করার সাথে সাথে যদি মন থেকে সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবে প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী সে মুকিন তথা একীনকারী হবে।

যদি ঈমানের সাথে সত্য জ্ঞান এমন প্রবল হয় যে, মধ্যবর্তী বিষয়সমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ, সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হওয়ার মনোভাব অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যায় এবং সেগুলোকে পুরস্কারের ফরমান লেখকের তুলনায় তার কলম ও হাতের মত মনে করে, কলম ও হাতের প্রতি কেউ কৃতজ্ঞ হয় না এবং অসন্তুষ্টও হয় না; বরং এগুলোকে পুরস্কারদাতার হাতিয়ার মনে করে, তবে দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী তাকে একীনকারী বলা হবে। এই একীন প্রথম একীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তার ফল ও প্রাণ। যখন মানুষের কাছে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার আদেশের এমন অধীন, যেমন লেখকের হাতে কলম, তখন তার অন্তরে তাওয়াক্কুল, সন্তুষ্টি ও

শিরোধার্যতা প্রবল হবে এবং সে ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও অসচ্চরিত্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

একীনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রিযিকের দায়িত্ব সম্পর্কে একীন করা । আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, সকলের রিযিকই আল্লাহর যিম্মায়। এতে আল্লাহ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ প্রতিশ্রুত এই রিযিক অবশ্যই পৌঁছবে এবং ভাগ্যে যা আছে তা অবশ্যই প্রেরণ করা হবে। এ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ শরীয়তের আইন অনুযায়ী রিযিক অন্বেষণ করেও যা পাবে না তার জন্যে আফসোস করবে না এবং লোভ-লালসায় লিপ্ত হবে না। এ বিশ্বাস থেকেও কিছু আনুগত্য ও উত্তম চরিত্র প্রকাশ পাবে।

তৃতীয় স্তর, অন্তরে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু প্রবল হবে ঃ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . অর্থাৎ "অতঃপর যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে কণা পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে।" অর্থাৎ, সওয়াব ও আযাবে বিশ্বাস করতে হবে। এমনকি, বুঝতে হবে যে, সওয়াবের সাথে সৎকর্মের সম্পর্ক উদরপূর্তির সাথে রুটির সম্পর্কের মত এবং আযাবের সাথে গোনাহর সম্পর্ক মরে যাওয়ার সাথে বিষপান বা সর্প দংশনের সম্পর্কের মত। মানুষ উদরপূর্তির জন্য যেমন রুটির অন্বেষণ প্রয়াসী হয় এবং অল্প বিস্তর যাই পায় তার হেফাযত করে, তেমনি সৎকর্ম করতে প্রয়াসী এবং কমবেশী যাই হোক, তা অর্জন করতে আগ্রহী হতে হবে। মানুষ যেমন কম ও বেশী বিষ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনি সামান্য, অসামান্য, কম বেশী সকল প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ বিষয়ে একীন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী অধিকাংশ মুমিনের হয়ে থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশেষভাবে নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের হয়ে থাকে। এ বিশ্বাসের ফল এই হয় যে, মানুষ তার উঠাবসা, চলাফেরা ও বিপদাশংকা নিরীক্ষণ করতে থাকে এবং সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হয়। একীন যত বেশী প্রবল হয়, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং সৎকর্মের প্রস্তুতি তত বেশী হয়।

চতুর্থ স্তর, আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমার সম্পর্কে জানেন এবং আমার মনের কুমন্ত্রণা, গোপন আশংকা ও চিন্তাসমূহ প্রত্যক্ষ করেন– এরূপ একীন করতে হবে। প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন প্রত্যেক মুমিনের অর্জিত হয়। অর্থাৎ, কেউ এতে সন্দেহ করে না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন দুর্লভ। তবে যাঁরা সিদ্দীক, তাঁরা এই একীনের অধিকারী হন। এর ফলস্বরূপ মানুষ একান্তেও তার সব কাজকর্মে আদব এবং শিষ্টাচার বজায় রাখে। কোন ব্যক্তি বাদশাহের দৃষ্টির সামনে উপবিষ্ট থাকলে সে সব সময় মাথা নীচু করে সকল কাজে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং শিষ্টাচার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। তেমনি মানুষ যখন জানবে, আল্লাহ তাআলা তার বাতেন সম্পর্কে যাহেরের মতই অবগত, তখন সে তার যাহেরী আমল ও বাতেনী চিন্তাভাবনা একই রূপ রাখতে চেষ্টা করবে। এ একীনে মানুষের মধ্যে লজ্জা, ভয়, বিনয়, নম্রতা, ও উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে এবং বড় বড় আনুগত্যের কারণ হয়। একীন যেন একটি বৃক্ষ, এসব চরিত্র যেন তার শাখা প্রশাখা। চরিত্র থেকে উদ্ভূত আমল ও আনুগত্য যেন ফল ও কলি, যা শাখা থেকে নির্গত হয়।

মোট কথা, একীনের মূল ভিত্তি এবং তার স্তর উপরোক্ত স্তরগুলো ছাড়া আরও অনেক রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ইনশাআল্লাহ এগুলো বর্ণিত হবে। একীনের শাব্দিক অর্থ বুঝাবার জন্যে এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে অনুধ্যান ও বিনয় সহকারে মাথানত করে চুপ থাকা– আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন বা নীরবতা সব কিছুতেই ভয়ের প্রতিফলন হওয়া; তাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হওয়া এবং তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই আমলের দলীল হওয়া। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ গাম্ভীর্যের সাথে বিনয় ও নম্রতার চেয়ে উত্তম পোশক আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করেননি। এটা পয়গম্বরগণের পোশাক এবং সিদ্দকী ও আলেমগণের লক্ষণ। বেশী কথা বলা, হাসিতে ডুবে থাকা, নড়াচড়া ও কথাবার্তায় পটু হওয়া– এগুলো সব আস্ফালন এবং আল্লাহর মহাশাস্তি ও গজব থেকে গাফেল থাকার লক্ষণ। এটা দুনিয়াদারদের রীতি, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে; আলেমগণের রীতি নয়। কেননা, সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেম তিন প্রকার– (১) যে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু তাঁর শাস্তির প্রকার সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে আদেশ করে। এ ধরনের এলেম

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না। (২) যে আল্লাহকে জানে কিন্তু তাঁর আদেশ ও শাস্তির প্রকার জানে না, এরা সাধারণ ঈমানদার। (৩) যাঁরা আল্লাহকেও জানে এবং তাঁর আদেশ ও শাস্তির প্রকার সম্পর্কেও অবগত, তাঁরা সিদ্দীক। ভয় ও বিনয় কেবল তাঁদের উপরই প্রবল থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন– এলেম অর্জন কর এবং এলেমের জন্যে গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা অনুশীলন কর। যাঁর কাছে শিখবে তাঁর প্রতি বিনয়ী হও। তোমার কাছে যে জ্ঞান অর্জন করবে তাঁর পক্ষেও তোমার প্রতি বিনয়ী হওয়া উচিত। অত্যাচারী আলেম হয়ো না। এরূপ হলে তোমার এলেম মূর্খতা অপেক্ষাও মন্দ হবে। কেউ বলেন ঃ যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে এলেম দান করেন, তখন তাঁকে এলেমের সাথে সহনশীলতা, বিনয়, সচ্চরিত্রতা ও নম্রতাও দান করেন। একেই বলা হয় কল্যাণকর এলেম। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ যাঁকে এলেম, সংসার নির্লিপ্ততা, বিনয় ও সচ্চরিত্র দান করেন, সে মোত্তাকীদের ইমাম হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে আছে– আমার উম্মতের মধ্যে এমন উত্তম লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত দেখে প্রকাশ্যে হাসে এবং তাঁর আযাবের ভয়ে সংগোপনে ক্রন্দন করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে আর অন্তর আকাশে। তাদের প্রাণ ইহজগতে এবং জ্ঞান বুদ্ধি পরজগতে। তারা গাম্ভীর্য সহকারে চলে এবং ওসিলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। অর্থাৎ, যে বিষয় নৈকট্যের কারণ মনে করে তা পালন করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ সহনশীলতা এলেমের উযীর, নম্রতা তার পিতা এবং বিনয় তার পোশাক। বিশর ইবনে হারেস বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম দ্বারা রাজত্ব কামনা করে, আল্লাহর নৈকট্য তার সাথে শত্রুতা রাখে। কারণ, সে আকাশ ও পৃথিবীতে ঘৃণিত। বনী ইসরাঈলের কাহিনীসমূহে বর্ণিত আছে– জনৈক দার্শনিক ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে তিনশ' ষাটটি গ্রন্থ রচনা করে একজন খ্যাতিমান দার্শনিক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তখনকার পয়গম্বরের প্রতি ওহী পাঠান, অমুক ব্যক্তিকে বলে দাও, তুমি তোমার গ্রন্থ দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে দিয়েছ। কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই আমার নিয়ত করনি। তাই আমি কিছুই কবুল করিনি। দার্শনিক একথা শুনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হল। সে জনগণের সাথে মিশে গেল, বাজারে ঘুরাফেরা করল, বনী ইসরাঈলের সাথে পানাহার অবলম্বন করল এবং মনে মনে বিনয়ী হল। তখন আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরের প্রতি

ওহী পাঠালেন– তাকে বলে দাও, এখন সে আমার সন্তুষ্টির তওফীক প্রাপ্ত হয়েছে।

আওযায়ী বেলাল ইবনে সা'দের এই উক্তি বর্ণনা করেন ঃ তোমরা শাহ্নার সিপাহীকে দেখলে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, অথচ নেতৃত্বলিপ্সু দুনিয়ার আলেমদেরকে দেখে খারাপ মনে কর না। পক্ষান্তরে এরা সিপাহীর তুলনায় অধিক ঘৃণার যোগ্য।

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা এবং সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। অতঃপর কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্ বন্ধু উত্তম? তিনি বললেন ঃ সে বন্ধু উত্তম যে তোমাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করে এবং তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ মন্দ সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে যে তোমাকে সাহায্য করে না, সে-ই মন্দ সঙ্গী। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। আরজ করা হল ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে, বলে দিন, যাতে আমরা তার সংসর্গে বসতে পারি। তিনি বললেন ঃ যাদের দিকে তাকালে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, তারা উত্তম। প্রশ্ন হল ঃ সর্বাধিক মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি মাগফেরাত কামনা করি। (এ কথাটি মন্দ লোকের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্যে বলা হয়েছে।) পুনরায় আরজ করা হল ঃ আপনি বলে দিন। তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক মন্দ লোক হচ্ছে বিপথগামী আলেম।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সে ব্যক্তিই অধিক নিশ্চিন্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে অধিক চিন্তা ভাবনা করত। আখেরাতে সে ব্যক্তিই হাসবে, যে দুনিয়াতে ক্রন্দন করত। আখেরাতে সর্বাধিক সুখী সে-ই হবে, যে দুনিয়াতে বহু দিন কষ্ট ভোগ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) এক খোতবায় বলেন ঃ তাকওয়া অবলম্বন করা সত্ত্বেও কারও আমলের ফসল যাতে ফ্যাকাসে ও ধ্বংস না হয়ে যায়, সে দায়িত্ব আমার। মানুষের মধ্যে সেই অধিক মূর্খ, যে তাকওয়ার মূল্য বুঝে না। আল্লাহ তাআলার কাছে সেই মন্দ, যে এলেম সকল জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ফেতনার অন্ধকারে হানা দেয় এবং নীচ লোকেরা তার নাম রাখে আলেম। তিনি আরও বলেন ঃ যখন তোমরা এলেম শুন, চুপ থাক এবং হাস্য-রসের

সাথে মিশ্রিত করো না। নতুবা অন্তরে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেম যখন একবার হাসে, তখন এক গ্রাস এলেম মুখ দিয়ে বের করে দেয়। কেউ বলেন ঃ ওস্তাদের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকলে তার কারণে শাগরেদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হবে। প্রথম– সবর, দ্বিতীয়– বিনয় এবং তৃতীয়– সচ্চরিত্র। পক্ষান্তরে শাগরেদের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকলে ওস্তাদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়– জ্ঞানবুদ্ধি, শিষ্টাচার ও উত্তম বোধশক্তি। সারকথা, কোরআনে বর্ণিত চরিত্র থেকে আখেরাতের আলেমগণ মুক্ত নন। তারা আমলের জন্যে কোরআন পাঠ করেন– কেবল পড়া ও পড়ানোর জন্যে নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এটা দেখেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের পূর্বে ঈমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কোন সূরা নাযিল হলে আমরা তার হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এবং সূরার মধ্যে বিরতির জায়গা জেনে নিতাম। এখন আমি এমন লোক দেখছি, যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়। তারা আলহামদু থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফেলে, কিন্তু জানে না তাতে কি আদেশ নিষেধ রয়েছে এবং বিরতি কোথায় হবে? তারা কোরআনকে পচা খেজুরের মত ছড়িয়ে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পাঁচটি চরিত্র আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ। এগুলো কোরআন মজীদের পাঁচটি আয়াত থেকে বুঝা যায়– ভয়, নম্রতা, বিনয়, সচ্চরিত্র ও দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাত অবলম্বন। ভয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ –একমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

নম্রতা এই আয়াত থেকে জানা যায়– خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا –তারা আল্লাহর কাছে নম্র, তাঁর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে না।

বিনয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ – আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্যে বাহু নত রাখুন।

সচ্চরিত্র এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ –আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্যে নম্র স্বভাব হয়েছেন।

সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা এ আয়াত থেকে জানা যায়– وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا – জ্ঞানপ্রাপ্তরা বলল ঃ তোমাদের দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া সওয়াব মুমিন ও সৎকর্মীর জন্যে উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন– فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ – অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ঃ বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ কি ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নূর যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন তা গ্রহণ করার জন্যে বক্ষ খুলে যায়। জিজ্ঞেস করা হল ঃ এর কোন পরিচয় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এর পরিচয় হল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হবে, পরকালের প্রতি মনোযোগী হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তারা অধিকাংশ কথাবার্তা এলেম ও আমল সম্পর্কে বলেন; বরং যেসব বিষয় আমল নষ্ট করে, মনকে পেরেশান করে, কুমন্ত্রণা জাগ্রত করে এবং অনিষ্ট সৃষ্টি করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন না। কেননা, অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা দ্বীনের মূল। আর যারা দুনিয়াদার আলেম তারা রাজ্যশাসন ও মামলা-মোকদ্দমার খুঁটিনাটি শাখা-প্রশাখা শিক্ষা করে। তারা এমন সব মাসআলা গড়ার কাজে পরিশ্রম করে, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কখনও বাস্তবে রূপ নেয় না, নিলেও তাদের জন্যে নয়– অন্যের জন্যে। অথচ যেসব বিষয় তাদের সাথে প্রতিনিয়ত লেগে থাকে, সেগুলো তারা ত্যাগ করেই বসে রয়েছে। যারা মানুষের কাছে নৈকট্যশীল ও প্রিয় হওয়ার উদ্দেশে এ ধরনের অবাস্তব ও অনাবশ্যক কাজ করে, তারাই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যাহত।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতিদান এই, তারা দুনিয়াতেও মানুষের প্রিয় হয় না এবং আখেরাতেও আল্লাহর কাছে তাদের কর্মসমূহ মূল্যহীন; বরং তারা বিপদাপদে জড়িত হয়ে তিক্ত জীবন যাপন করে। তারা কেয়ামতে রিক্তহস্তে যাবে এবং আখেরাতের আলেমগণের সাফল্য ও সৌভাগ্য দেখে অনুতাপ করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা বেশীর ভাগ পয়গম্বরগণের কথাবার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং চরিত্র ও জীবনপদ্ধতিতে তিনি অন্যের তুলনায় বেশীর ভাগ সাহাবায়ে কেরামের নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁর এ দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবাই একমত। তাঁর অধিকাংশ ওয়ায-নসীহত, অন্তরের বিপদাশংকা, আমলের অনিষ্ট, নফসের কুমন্ত্রণা, নফসের গোপন ও সূক্ষ্ম খাহেশাতের অনিষ্ট সম্পর্কে হত। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এমন ওয়ায করেন যা আমরা অন্যদের কাছে শুনি না। আপনি এই ওয়ায কোথায় শিখলেন? তিনি বললেন ঃ সাহাবী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)-এর কাছ থেকে শিখেছি। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এমন কথাবার্তা বলেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একশ' সাহাবীর মধ্যে কারও মুখে শুনি না। আপনি এই কথাবার্তা কোথা থেকে আয়ত্ত করলেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমি এটা লাভ করেছি। অন্যরা তাঁকে কল্যাণের অবস্থা জিজ্ঞেস করত, আমি অনিষ্টের অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম। আমি কোথাও অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ি– এই আশংকায়ই এরূপ করতাম। কল্যাণ আমার কাছে আসবে– এটা আমি জানতাম। এক রেওয়ায়েতে আছে– আমি জানতাম, যে অনিষ্ট চেনে না সে কল্যাণও চেনে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করত– যে এমন ধরনের কাজ করে সে কি সওয়াব পাবে? অর্থাৎ, তাঁরা আমল ও ফযীলত সম্পর্কে প্রশ্ন রাখত আর আমি জিজ্ঞেস করতাম– ইয়া রসূলাল্লাহ, কিসে অমুক অমুক আমল নষ্ট করে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দেখলেন, আমি কেবল আমল নষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাকে বিশেষভাবে এ শিক্ষাই দান করলেন। হযরত হুযায়ফা নেফাক ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানার ব্যাপারেও একক ছিলেন। হযরত ওমর, ওসমান ও বড় বড় সাহাবীগণ তাঁকে ফেতনার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। মোনাফেকদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের

সংখ্যা বলে দিতেন– নাম বলতেন না। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নিজের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন– আমার মধ্যে কোন নেফাক তো নেই? তিনি তাঁকে নেফাক থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলতেন। হযরত ওমরকে কোন জানাযার নামায পড়ার জন্যে ডাকা হলে তিনি দেখতেন, সেখানে হুযায়ফা উপস্থিত আছেন কিনা? উপস্থিত থাকলে তিনি নামায পড়তেন, নতুবা পড়তেন না। হযরত হুযায়ফার উপাধি ছিল 'ছাহিবুস সির' অর্থাৎ রহস্যজ্ঞানী। মোট কথা, অন্তরের স্তর ও অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা আখেরাতের আলেমগণের রীতি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্যে অন্তরই প্রচেষ্টা চালায়। বর্তমানে এ শাস্ত্র দুর্লভ ও প্রাচীন হয়ে গেছে। কোন আলেম এ শাস্ত্রে কোন বিষয়ের প্রয়াসী হলে মানুষ আশ্চর্যবোধ করে এবং বলে ঃ এটা কেবল ওয়ায়েযদের ধোকা। তারা কেবল বিবাদ বিতর্কের মধ্যেই সত্যিকার বিষয় নিহিত আছে বলে মনে করে। কেননা, সত্য তিক্ত এবং তা জানা কঠিন। এর পথও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বিশেষতঃ অন্তরের গুণাবলী জানা ও অন্তরকে মন্দ চরিত্র থেকে পাক পবিত্র করা তো মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল। সুতরাং এমন পথের দিকে মানুষ বেশী আকৃষ্ট হবে কেমন করে। কথিত আছে, বসরায় একশ' বিশ জন ওয়ায়েয ছিল, কিন্তু তাদের তিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ একীন ও অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করত না। এ তিন জন ছিলেন সহল তস্তরী, ছবিহী ও আবদুর রহীম। তাদের ওয়াযে অসংখ্য জনসমাগম হত, কিন্তু এই তিন জনের ওয়াযে দশ জনের বেশী শ্রোতা থাকত না। কেননা, বিশেষ লোকগণই উৎকৃষ্ট বস্তুর যোগ্য হয়ে থাকে। আর জনগণকে যা দেয়া হয়, তা সহজ হয়ে থাকে। তার প্রার্থী হয় অনেক।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান গরিমায় অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের স্বচ্ছ উপলব্ধির উপর ভরসা করেন, কিতাব বা গ্রন্থের উপর করেন না। অন্যের কাছ থেকে শোনা বিষয়ের উপরও তাঁরা ভরসা করেন না। তাঁরা কেবল শরীয়তের কর্ণধার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তকলীদ তথা অনুসরণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের তকলীদও এদিক দিয়ে করেন, তাঁদের কাজকর্মগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শোনার উপর ভিত্তিশীল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন, সেগুলো অবশ্যই কোন তাৎপর্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল। কাজেই তাঁর

উক্তি ও কর্ম অনুসরণ করার পর সেগুলোর যথাযথ তাৎপর্য অনুসন্ধান করা উচিত। কেননা, আলেম যদি যা শুনে তাই মনে রাখে, তবে সে এলেমের পাত্র হবে– আলেম হবে না। এজন্যেই আগেকার দিনে এধরনের ব্যক্তিকে এলেমের পাত্র বলা হত, আলেম বলা হত না। সুতরাং যে কেবল মুখস্থ করে এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত নয়, তাকে আমরা আলেম বলব না। পক্ষান্তরে যার অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায় এবং সে হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়, সে আপনা আপনি অনুসৃত হয়ে যায়। অপরের তকলীদ করা তার উচিত নয়। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ এমন নয়, যার সব কথাই মেনে নেয়া যায়– কতক মেনে নেয়া হয় এবং কতক মেনে নেয়া হয় না। ইবনে আব্বাস ফেকাহ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর কাছে শিখেছিলেন এবং কেরাআত হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-ক শুনিয়েছিলেন। এরপর উভয় শাস্ত্রে উভয় ওস্তাদের সাথে মতভেদ করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা তো আমরা শিরোধার্য করে নেই। আর সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার কিছু অংশ গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ করি না। তাবেয়ীগণের কাছ থেকে যা পেয়েছি– সেক্ষেত্রে তাঁরাও মানুষ এবং আমরাও মানুষ। সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থার ইঙ্গিত স্বচক্ষে দেখেছেন। ইঙ্গিত দ্বারা তাঁরা যা জেনেছেন, তার সাথে তাঁদের অন্তর সম্পৃক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কের কারণে তাঁরা সত্যের উপর স্থির রয়েছেন। ইঙ্গিত দ্বারা যা বুঝা যায়, তা রেওয়ায়েত ও ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

অপরের কাছ থেকে শোনা কথার উপর ভরসা করা যখন অপছন্দীয় তকলীদ, তখন কিতাব ও রচনাবলীর উপর ভরসা করা আরও অবান্তর। বরং কিতাব ও রচনাবলী নতুন জিনিস। সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং কিছুটা তাবেয়ীগণের যুগে কোন কিতাব অথবা রচনা ছিল না। হিজরতের একশ' বিশ বছর পরে সমস্ত সাহাবী ও কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর ওফাতের পর রচনার সূত্রপাত হয়। সাহাবায়ে কেরাম তো হাদীসের কেতাব লেখা ও রচনা করা খারাপ মনে করতেন। তাঁরা আশংকা করতেন, মানুষ কিতাবের উপর ভরসা করে হাদীস মুখস্থ করা, কোরআন পাঠ করা এবং বুঝা ছেড়ে দিতে পারে। তাঁরা বলতেন ঃ আমরা যেমন মুখস্থ করি,

তোমরাও মুখস্থ কর। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী কোরআন মজীদকে মাসহাফ তথা গ্রন্থাকারে একত্রিত করা উপযুক্ত মনে করেননি। তাঁরা বলতেন ঃ যে কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) করেননি, আমরা তা কিরূপে করতে পারি ? কাজেই কোরআনকে এমনিভাবে রেখে দাও এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখে নাও। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) ও অবশিষ্ট সাহাবীগণ এই আশংকায় কোরআন লেখতে বললেন যে, মানুষ অবহেলা ও শৈথিল্য করবে অথবা পড়ার ক্ষেত্রে কোন শব্দ অথবা মিলের খেলাফ হলে তা দূর করার জন্যে কোন মূল পাওয়া যাবে না। এভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মনও এ কাজের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি কোরআন মজীদ সংগ্রহ করে মাসহাফে তথা পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম মালেককে মুয়াত্তা রচনা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ যে কাজ সাহাবায়ে কেরাম করেননি, আপনি তার উদ্ভাবন করবেন না। কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম রচিত কিতাব হচ্ছে ইবনে জুরায়জের কিতাব– যাতে মনীষীগণের উক্তি এবং মুজাহিদ, আতা ও হযরত ইবনে আব্বাসের শাগরেদদের বর্ণিত তফসীরসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। এটি মক্কা মোয়াযযমায় সংকলিত হয়। এরপর মা'মার ইবনে রাশেদ সানআনীর হাদীস সম্বলিত কিতাব ইয়ামনে গ্রন্থিত হয়। এরপর ইমাম মালেকের মুয়াত্তা এবং সুফিয়ান সওরীর জামে' রচিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে কালাম শাস্ত্রের রচনাবলী প্রকাশ পায় এবং প্রচুর পরিমাণে কলহ-বিবাদ ও বাজে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। মানুষ এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং কিসসা ও ওয়ায বলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

তখন থেকে একীন শাস্ত্র হ্রাস পেতে থাকে এবং পরে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, অন্তরের এলেম ও নফসের ভালমন্দ অবস্থা জানা একটি দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়। কয়েকজন আগ্রহী ব্যক্তি ছাড়া সবাই এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন সে-ই আলেম কথিত হয়, যে মোনাযারা করে, কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ওয়াযে খুব চটকদার ভাষায় ও ছন্দপূর্ণ বাক্যে কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে। এর কারণ, এগুলো জনসাধারণ শুনে, যারা জানে না, কোন্‌টি বাস্তব এলেম এবং কোন্‌টি অবাস্তব। সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ও এলেম তাঁদের জানা নেই যাতে তার সাথে মিলিয়ে দেখে নেবে যে, আজকালকার আলেমরা তাঁদের

সম্পূর্ণ বিপরীত। এদিক দিয়েই জনসাধারণ যাকে কিছু বলতে শুনেছে, তাকে আলেম বলে দিয়েছে। পরবর্তীরাও এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদেরই পদাংক অনুসরণ করেছে। ফলে আখেরাতের এলেম শিকায় উঠেছে। পূর্বেকার যুগে যখন দ্বীনের এই ঢিলে অবস্থা, তখন বর্তমানকালের অবস্থা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। এখন যদি কেউ কালাম শাস্ত্র অস্বীকার করে, তবে উন্মাদ বলা হয়। কাজেই এখন নীরবে নফসের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করাই উত্তম।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা বেদআত তথা নবাবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে সযত্নে বেঁচে থাকেন, যদিও সকল জনসাধারণ সে বিষয়ে একমত হয়ে যায়। যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে নতুন আবিষ্কৃত হয়, তাতে জনসাধারণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দরুন বিভ্রান্ত হন না। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনালেখ্য ও কাজকর্মের অন্বেষণে ব্রতী হন এবং দেখেন, তাঁদের শক্তি কি কি বিষয়ে নিয়োজিত ছিল– শিক্ষকতায়, রচনায়, মোনাযারায়, বিচারক ও শাসক হওয়ায়, ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী হওয়ায়, এতীমের মালের রক্ষক হওয়ায়, শাসকদের সাথে উঠাবসা করায় নিয়োজিত ছিল, না ভয়, চিন্তা-ভাবনা ও মোজাহাদায়, যাহের ও বাতেনের মোরাকাবায়, ছোট বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষায়, নফসের গোপন খায়েশ জানায় এবং শয়তানের চক্রান্ত উদঘাটন করায় তাঁরা মশগুল ছিলেন? একথা নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, সে ব্যক্তিই বেশী আলেম এবং সত্যের অধিক নিকটবর্তী, যাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে অধিক মিল রয়েছে এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের পন্থা সম্পর্কে যে অধিক ওয়াকিফহাল । কেননা, দ্বীন তাঁদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে অধিক দ্বীনদার । একথা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন কেউ তাঁকে বলেছিল ঃ আপনি অমুক ব্যক্তির বিরোধিতা করেছেন। মোট কথা, তোমার কাজকর্ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানার অনুরূপ হলে সমকালীন লোকদের বিরোধিতার পরওয়া করো না। কারণ, লোকেরা তাঁদের মনের খাহেশ অনুযায়ী একটি নীতি ঠিক করে নিয়েছে এবং তারা একথা স্বীকার করতে সম্মত নয় যে, তাদের নীতি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ফলে তারা দাবী করে, এ নীতি ছাড়া জান্নাত লাভের কোন পথ নেই। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ ইসলামে দুই শ্রেণীর নতুন

লোক সৃষ্টি হয়ে গেছে– (১) যাদের নীতি খারাপ, কিন্তু তারা বলে যে, জান্নাত তার জন্যই, যার নীতি তাদের নীতির অনুরূপ। (২) ধনী দুনিয়াদার, যারা দুনিয়ার জন্যই সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয় এবং দুনিয়াই অন্বেষণ করে। সুতরাং তুমি উভয় শ্রেণীকে বর্জন কর এবং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে দাও। যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে, যাকে ধনীরা তাদের দুনিয়ার দিকে আর বেদআতীরা তাদের ভ্রষ্ট নীতির দিকে ডাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় দল থেকে দূরে রাখেন এবং সে পূর্ববর্তী মনীষীদের কর্মপন্থা অনুসরণ করে, তবে তুমিও তাঁর মতই হয়ে যাও। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকে মওকুফ ও মরফু উভয় পন্থায় বর্ণিত আছে, শিক্ষণীয় বিষয় দুটিই– একটি কালাম ও অপরটি চরিত্র । কালামের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কালাম এবং চরিত্রের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র । সাবধান, তোমরা নতুন বিষয়াদি থেকে দূরে সরে থাক। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন বিষয় । নতুন বিষয় মানেই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা । খবরদার, নিজের জীবনকে বেশী মনে করো না, নতুবা তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে। মনে রেখো, যে বস্তু আসবে তা কাছেই । দূরে সে বস্তু যা আসে না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ কারণে বলেন ঃ সে ব্যক্তিই সুখী যে নিজের দোষ দেখে অন্যের দোষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে এবং গোনাহগারদের কাছ থেকে বেঁচে থাকে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলতেন ঃ শেষ যমানায় সচ্চরিত্র হওয়া অনেক আমলের তুলনায় উত্তম হবে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে সৎকর্মে অগ্রণী । সত্বরই তোমাদের পরে এমন এক সময় আসবে, যখন উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে দৃঢ়পদ থাকে এবং কর্ম সম্পাদনে তড়িঘড়ি করে না। কেননা, সন্দেহ সংশয় হবে অনেক– এ উক্তি যথার্থ । কেননা, এ যুগে কাজকর্মে যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি না দেয় এবং যেসব কাজে সবাই লিপ্ত, তাতে সেও লিপ্ত হয়ে যায়, তবে সকলের মত সে-ও বরবাদ হবে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরও বিস্ময়কর উক্তি করেছেন। তিনি বলেন ঃ এসময়ে তোমাদের পুণ্য পূর্ববর্তী সময়ের পাপ, আর এখন যাকে তোমরা পাপ মনে কর তা পূর্বযুগে পুণ্য ছিল। তোমরা যতক্ষণ সত্যকে

চিনবে, ততক্ষণ কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ পুণ্য কাজ সাহাবায়ে কেরামের যুগে অস্বীকৃত ছিল। উদাহরণতঃ আজকাল পুণ্যের ধোঁকায় মসজিদসমূহের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং দালানের কারুকার্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করা হয়। মসজিদে কার্পেট বিছানো হয়। অথচ পূর্বে মসজিদে চট বিছানোও বেদআতরূপে গণ্য হত। কথিত আছে, মসজিদে ফরাশ ইত্যাদি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আবিষ্কার। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ মসজিদের মাটিতে কমই ফরাশ বিছাতেন। মোনাযারা বিতর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করাকেও আজকাল বড় পুণ্য কাজ মনে করা হয়। অথচ পূর্বে একে খুব মন্দ কাজ মনে করা হত। কোরআন পাঠ এবং আযানে সুরেলা কণ্ঠও এরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ তোমরা এখন এমন এক যমানায় রয়েছ, যাতে খাহেশ এলেমের অনুসারী, কিন্তু এক সময় আসবে যখন এলেম খাহেশের অনুসারী হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ মানুষ সুন্নত পরিত্যাগ করে নতুন নতুন বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত রয়েছে । এগুলোর মধ্যে এলেম খুব কম । আল্লাহ সাহায্য করুন । মালেক ইবনে আনাস বলেন ঃ মানুষ আজকাল যা জিজ্ঞেস করে, অতীতে তা জিজ্ঞেস করত না। আলেমগণ হারাম ও হালাল বর্ণনা করতেন না। আমি তাঁদেরকে মোস্তাহাব ও মকরূহ্ বর্ণনা করতে দেখেছি । অর্থাৎ, তাঁদের দৃষ্টি কেবল মোস্তাহাব ও মকরূহ বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত । হারাম থেকে তাঁরা বেঁচেই থাকতেন। আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলতেন ঃ কারও অন্তরে কোন ভাল বিষয় ইলহাম হলে সুন্নতে তার অস্তিত্ব আছে কিনা, যাচাই না করা পর্যন্ত আমল করা উচিত নয়। সুন্নতে তার অস্তিত্ব পাওয়া গেলে আল্লাহর শোকর করে আমল করবে। এ কথা বলার কারণ, আজকাল নতুন নতুন অনেক বিষয় শুনে মানুষ অন্তরে তা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এতে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হয়। ফলে মিথ্যাকে সত্য মনে করতে থাকে। তাই সাবধানতা জরুরী। এ কারণেই মারওয়ান ঈদের নামাযে ঈদগাহের সন্নিকটে মিম্বর তৈরী করালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে মারওয়ান! এটা কি বেদআত? মারওয়ান বলল ঃ এটা বেদআত নয়; বরং উত্তম কাজ। আপনি জানেন, অনেক লোক সমাগত হয়। তাই আমি সকলের কাছে আওয়ায পৌঁছাতে চেয়েছি। তিনি বললেন

ঃ আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তা থেকে উত্তম কাজ তুমি কখনও করবে না। আজ আমি তোমার পেছনে নামায পড়ব না। হযরত আবু সায়ীদের এ অস্বীকৃতির কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের খোতবা এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া করার সময় ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিতেন; মিম্বরে আরোহণ করতেন না। এক হাদীসে আছে–

مـن احـدث فـى ديـنـنـا مـا لـيـس مـنـه فـهـورد ‘যেব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সে প্রত্যাখ্যাত।’ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– যেব্যক্তি আমার উম্মতকে ধোঁকা দেয়, তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। কেউ আরজ করল ঃ আপনার উম্মতকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ বেদআত সৃষ্টি করে তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তাআলার এক ফেরেশতা প্রত্যহ ঘোষণা করে– যেব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নতের খেলাফ করে, সে তাঁর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে। যেব্যক্তি সুন্নত বিরোধী বেদআত সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে গোনাহগার হয়, সে অন্যান্য গোনাহগারের তুলনায় এমন, যেমন বাদশাহকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তি সে ব্যক্তির তুলনায়, যে কোন বিশেষ কাজে বাদশাহর কথা অমান্য করে। এ ক্রটি বাদশাহ কখনও ক্ষমা করে দেন, কিন্তু সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তির দোষ কখনও ক্ষমা করেন না। কোন এক মনীষী বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সে বিষয়ে চুপ থাকা অন্যায় এবং যে বিষয়ে তাঁরা চুপ রয়েছেন, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বাড়াবাড়ি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মধ্যবর্তী পথ আঁকড়ে ধর। যে এ পথ থেকে এগিয়ে চলে যায়, সে ফিরে আসুক এবং যে পেছনে থেকে যায় সে এগিয়ে যাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পথভ্রষ্টরা অন্তরে পথভ্রষ্টতারও মিষ্টতা অনুভব করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا ۔

অর্থাৎ, যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে, তাদেরকে পরিত্যাগ কর।

তিনি আরও বলেন ঃ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا
অর্থাৎ, যার সামনে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করে পেশ করা হয়, সে তাকে কল্যাণকর মনে করে।

অতএব যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইবলীস তার সাঙ্গোপাঙ্গকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তারা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে ফিরে এলে ইবলীস জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি করলে? তারা বলল ঃ আমরা সাহাবীদের মত লোক দেখিনি। তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন চক্রান্তই সফল হয় না। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ইবলীস বলল ঃ বাস্তবিকই তোমাদের সাধ্য হবে না। কেননা, তাঁরা তাঁদের নবীর সংসর্গলাভ এবং কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু শীঘ্র তাঁদের পরে কিছু লোক জন্ম নেবে, যাদের কাছে তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। এরপর তাবেয়ীদের যুগ এলে ইবলীস আবার তার দলবল ছড়িয়ে দিল। তারা পূর্বের ন্যায় ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসে বলল ঃ আমরা তাঁদের মত অধিক আশ্চর্যজনক লোক দেখিনি। কোথাও আমাদের চক্রান্ত সফল হলে এবং কিছু গোনাহ করাতে পারলে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আল্লাহ্ তাঁদের পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন্। ইবলীস বলল ঃ তোমরা তাঁদের কাছ থেকেও কিছু পাবে না। কারণ, তাঁদের তওহীদ সঠিক এবং নবীর সুন্নত অনুসরণের কারণে সবল। তাঁদের পর এক সম্প্রদায় আসবে, যাদের দ্বারা তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। খাহেশের লাগাম ধরে তোমরা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাদের ক্ষমা করা হবে না। তারা এমন তওবা করবে না যে, আল্লাহ্ তাঁদের তওবার দৌলতে পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী লোকদের মধ্যে শয়তান বেদআত ছড়িয়ে একে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিল। ফলে তারা বেদআতকে হালাল জ্ঞান করল এবং দ্বীনের কাজ বলে ধরে নিল। তারা বেদআত করে ক্ষমা প্রার্থনাও করে না এবং তওবাও করে না। ইবলীস তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা টেনে নেয়। যদি বল, ইবলীস তো কারও সাথে কথা বলে না, অতএব বর্ণনাকারী এসব কথা কোত্থেকে জানলেন? এর জওয়াব, আধ্যাত্ম পুরুষের কাছে জগতের বহু গোপন রহস্য উদঘাটিত হয়। কখনও তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের অন্তরে অপ্রকাশিত

বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়ে যায়। একে বলা হয় ইলহাম। কখনও সত্য স্বপ্নের আকারে তাঁরা রহস্য অবগত হয়ে যান এবং কখনও জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টান্ত দেখে রহস্য জেনে নেন। জাগ্রত অবস্থায় জেনে নেয়া নবুওয়তের একটি সুউচ্চ স্তর। যেমন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম স্তর। খবরদার, এই এলেম পাঠ করে তুমি সম্পূর্ণ তোমার বিবেকের বাইরের বিষয়সমূহ অস্বীকার করতে শুরু করো না। এ ব্যাপারে বড় বড় পণ্ডিতও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, যারা দাবী করত, তাঁরা সকল যুক্তিশাস্ত্রে বিজ্ঞ। বলাবাহুল্য, যে যুক্তিশাস্ত্র ওলীআল্লাহগণের এসব বিষয়কে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে, তা থেকে মূর্খতাই শ্রেয়ঃ। যারা ওলীদের এসব বিষয় অস্বীকার করে, তারা পয়গম্বরগণকেও অস্বীকার করতে পারে। ফলতঃ তারা ধর্মচ্যুত হয়ে যায়।

জনৈক সাধক বলেন ঃ আবদালগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। কারণ, এ যুগের আলেমগণকে দেখার সাধ্য তাঁদের নেই। তাঁদের মতে এ যুগের আলেমরা আল্লাহ তাআলাকে জানে না। অথচ নিজেদের এবং মূর্খদের ধারণায় তারা আলেম। সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ গাফেলদের কথা এবং দুনিয়ায় মগ্ন আলেমদের কথা শোনা উচিত নয়। বরং তারা যে কথা বলে, তাতে তাদেরকে দোষী মনে করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রিয় বিষয়বস্তুর মধ্যে মগ্ন থাকে এবং যে বিষয় প্রিয় বিষয়বস্তুর অনুকূল নয়, তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ـ

অর্থাৎ, "যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সীমালংঘন করাই যার কাজ, তার কথা মেনে চলো না।"

যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ নিজেদেরকে আলেম মনে করে, তাদের তুলনায় মূর্খ জনসাধারণও ভাল। কারণ, পাপী জনসাধারণ তাদের ত্রুটি ও গোনাহ্ স্বীকার করে এবং তজ্জন্য তওবা এস্তেগফার করে। কিন্তু এই আলেমরূপী জাহেলরা এমন এলেমে মশগুল থাকে, যদ্দারা দুনিয়া

অর্জন করা যায়। তাঁরা দ্বীনের পথে চলা থেকে গাফেল হয়ে তওবা এস্তেগফার কিছুই করে না এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই একই ধ্যানে মগ্ন থাকে। আল্লাহ যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন তাদের ছাড়া অধিকাংশ লোকেরই এ অবস্থা। তাদের সংশোধনের আশা নেই। তাই দ্বীনদার সাবধানী ব্যক্তির জন্যে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে তাদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে বসে থাকা। সেমতে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ "নির্জনবাস" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই ইউসুফ ইবনে আসবাত হুযায়ফা মারআশীকে লেখেছিলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি ধারণা করেন, আমি এমন পর্যায়ে রয়েছি, আমার সাথে খোদা স্মরণকারী কেউ নেই। কাউকে পাওয়া গেলে তার সাথে যিকির করা গোনাহের কাজই হয়। আর এ কথা যথার্থ। কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে গীবত করা অথবা গীবত শুনা থেকে বাঁচা যায় না। অথবা মন্দ কাজ দেখে চুপ থাকতে হয়। অথচ এলেম শিক্ষা দেয়া অথবা শিক্ষা করা মানুষের উত্তম অবস্থা। চিন্তা করলে দেখা যায়, এলেমকে দুনিয়া অন্বেষণের উপায় ও মন্দ কাজের ওসিলা করাই শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ওস্তাদ হবে তার সাহায্যকারী ও মন্দ কাজের উপকরণ প্রস্তুতকারী। যেমন, কেউ ডাকাতের হাতে তরবারি বিক্রয় করে। এলেমও তরবারি সদৃশ। এতে কল্যাণের যোগ্যতা এমন, যেমন তরবারিতে জেহাদের যোগ্যতা। কাজেই যেব্যক্তি ডাকাতির জন্যে তরবারি কিনতে চায় বলে ইঙ্গিতে জানা যায়, তার কাছে তরবারি বিক্রয় করা জায়েয নয়।

এ পর্যন্ত আখেরাতের আলেমগণের বারটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল। এর প্রত্যেকটিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের কিছু কিছু চরিত্র বিধৃত হয়েছে। অতএব তুমি হয় এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যাও, না হয় নিজের ত্রুটি স্বীকার করে এসব গুণে বিশ্বাসী হয়ে থাক। কিন্তু খবরদার, এ দু'পথ ছাড়া তৃতীয় পথ অবলম্বন করো না। নতুবা তুমি দুনিয়ার উপায়কে দ্বীন বলতে শুরু করবে এবং মিথ্যুকদের চরিত্রকেই খাঁটি আলেমগণের চরিত্র বলে সাব্যস্ত করবে। ফলে মূর্খতা ও অস্বীকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে ভিড়ে যাবে, যাদের বাঁচার কোন আশাই নেই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবেক ও তার মাহাত্ম্য

প্রকাশ থাকে যে, বিবেকের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না- বিশেষতঃ জ্ঞানের মাহাত্ম্য জেনে নেয়ার পর। কেননা, বিবেক হচ্ছে জ্ঞানের উৎসমূল। বিবেকের তুলনায় জ্ঞান এমন, যেমন বৃক্ষের তুলনায় ফল অথবা সূর্যের তুলনায় আলো। অতএব যে বিষয়টি দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়, তা শ্রেষ্ঠ হবে না কেন? চতুষ্পদ জন্তু হিতাহিত জ্ঞান কম থাকা সত্ত্বেও বিবেকের সামনে মাথা নত করে। সেমতে যে জন্তু সর্বাপেক্ষা বড় এবং বেশী ক্ষতিকর ও ভীতিপ্রদ, সে জন্তুও মানুষকে দেখে মাথা নুইয়ে দেয় এবং ভয় পায়। কারণ, এতটুকু বোধশক্তি তার আছে যে, মানুষ তার উপর প্রবল হয়ে যাবে। কেননা, সে যে কলাকৌশল জানে, তা আর কেউ জানে না। এজন্যেই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ বৃদ্ধ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন, যেমন নবী তার সম্প্রদায়ের মধ্যে। এটা বিপুল অর্থ-সম্পদ, বিশাল দেহ এবং অধিক শক্তির কারণে নয়; বরং অধিক অভিজ্ঞতার কারণে, যা বিবেকের ফসল। এ কারণেই তুর্কী, কুর্দী ও আরব জনসাধারণকে দেখা যায়, তারা মূর্খতায় চতুষ্পদ জন্তুদের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও মজ্জাগতভাবে বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এ কারণেই জনৈক শত্রু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শহীদ করতে চাইল এবং তার দৃষ্টি তাঁর নূরোজ্জ্বল তথা জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলের উপর পতিত হল, তখন সে কেঁপে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উজ্জ্বল ললাটে বিরাজমান নবুওয়তের নূর শত্রুর দৃষ্টিতে ঝলসে উঠল।

মোট কথা, বিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব জাজ্বল্যমান বিষয়। কিন্তু এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে যেসব কোরআনী আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে, এখানে সেগুলো উল্লেখ করাই আমাদের লক্ষ্য।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বিবেককে নূর বলে অভিহিত করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (আলো)।

তিনি বিবেক থেকে উদ্ভূত এলেমকে রূহ, ওহী ও হায়াত (জীবন) বলে ব্যক্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۔

অর্থাৎ, "এমনিভাবে আমি আমার আদেশে আপনার কাছে রূহ্ প্রেরণ করেছি।"

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ ۔

অর্থাৎ, "যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আলো দিয়েছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে।"

আল্লাহ তাআলা যেসব জায়গায় "নূর ও জুলুমাত" তথা আলো ও অন্ধকার উল্লেখ করেছেন, সেখানে অর্থ, এলেম ও মূর্খতা বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ۔

অর্থাৎ, "তিনি তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহকে চেন এবং পরস্পর একে অপরকে বিবেকের উপদেশ দাও। এতে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ জানতে পারবে। জেনে রাখ, বিবেক তোমাদেরকে তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে মাহাত্ম্য দান করবে। জেনে রাখ, সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, যদিও সে দেখতে কুশ্রী, মান্যতায় নিকৃষ্ট এবং মর্যাদায় কম হয়। আর জাহেল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করে। তার তুলনায় শূকর ও বানর অধিক বিবেকবান। দুনিয়াদার তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না, তা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা বিবেক সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন– সামনে এস। সে সামনে এলে বললেন ঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এর পর আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ আমার ইযযত ও মাহাত্ম্যের কসম, আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার মাধ্যমেই সম্মান ছিনিয়ে নেব, তোমার মাধ্যমেই

সম্মান দেব, তোমার কারণেই সওয়াব দেব এবং তোমার কারণেই শাস্তি দেব।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তির অতিরঞ্জিত প্রশংসা হলে তিনি বললেন ঃ লোকটির বিবেক কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত ও বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের ব্যাপারে তার অধ্যবসায়ের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করছি, আর আপনি তার বিবেকের অবস্থা জানতে চাইছেন, এটা কেন? তিনি বললেন ঃ বিবেকহীন ব্যক্তি মূর্খতার কারণে পাপাচারীর চেয়ে বেশী পাপ করে ফেলে। আসন্ন কেয়ামতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হওয়ার স্তর বিবেক অনুযায়ী উচ্চতর হবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের উপার্জনের মধ্যে বিবেক বুদ্ধির সমান কোন কিছু নেই। বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে হেদায়াতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষের বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন সঠিক হয় না। এক হাদীসে আছে–

"মানুষ তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার ও রাত্রি জাগরণকারীর স্তরে উন্নীত হয়। কারও বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সচ্চরিত্রতা পূর্ণ হয় না। বিবেক পূর্ণ হয়ে গেলে ঈমান পূর্ণ হয়, পরওয়ারদেগারের আনুগত্য অর্জিত হয় এবং সে তার দুশমন শয়তানের নাফরমান হয়ে যায়।"

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর একটি ভরসা আছে। ঈমানদারের ভরসা হল বিবেক। অতএব তার এবাদত তার বিবেক অনুযায়ীই হবে। তুমি কি শুননি, দোযখে কাফেররা বলবে–

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۔

অর্থাৎ, "যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক খাটাতাম, তবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।"

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) তামীম দারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মধ্যে সর্দার কোন্‌টি? সে বলল ঃ বিবেক। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এ প্রশ্নই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে

করেছিলাম। তিনিও এ উত্তরই দেন এবং বলেন ঃ আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নেতৃত্ব কি? তিনি বললেন ঃ বিবেক। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অত্যধিক প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ লোকসকল, প্রত্যেক বস্তুর একটি বাহন আছে, মানুষের বাহন হচ্ছে বিবেক। তোমাদের মধ্যে তার যুক্তি প্রমাণই উত্তম, যার বিবেক বেশী। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মানুষকে একথা বলাবলি করতে শুনলেন ঃ অমুক অমুকের চেয়ে বেশী বীর প্রমাণিত হয়েছে এবং যুদ্ধের পরীক্ষায় অমুক অমুকের চেয়ে অধিক উত্তীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এসব বিষয় তোমরা জান না। লোকেরা আরজ করল ঃ তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ তারা ততটুকু যুদ্ধ করেছে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিবেক দান করেছিলেন। তাদের জয়-পরাজয়ও তাদের বিবেক অনুসারে হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের স্তর বিভিন্ন রূপ হয়েছে। কেয়ামতের দিন তারা তাদের বিবেক ও নিয়ত অনুসারে মর্যাদা লাভ করবে। বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ফেরেশতারা বিবেক দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঈমানদাররা তাদের বিবেক দ্বারা চেষ্টা করেছেন। অতএব যে আল্লাহর এবাদত করে, তার বিবেকও বেশী। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলাম, দুনিয়াতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন ঃ বিবেকের দ্বারা! আমি বললাম ঃ আখেরাতে কোন্ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন, বিবেক দ্বারা। আমি আরজ করলাম ঃ তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিদান হবে না? তিনি বললেন ঃ আয়েশা, তারা কর্ম ততটুকু করে থাকবে, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে বিবেক দিয়ে থাকবেন। অতএব বিবেক অনুপাতেই কর্ম হবে এবং তার প্রতিদান দেয়া হবে।

হযরত্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বিষয়ের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার আছে। মুমিনের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার হচ্ছে বিবেক। প্রত্যেক বস্তুর স্তম্ভ আছে। দ্বীনের স্তম্ভ বিবেক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি রক্ষক আছে। এবাদতকারীদের রক্ষক বিবেক। প্রত্যেক সওদাগরের পুঁজি আছে। মুজতাহিদদের পুঁজি বিবেক। প্রত্যেক

আহলে বায়তের জন্যে এক ব্যবস্থাপক আছে। সিদ্দীকগণের গৃহের ব্যবস্থাপক বিবেক। প্রত্যেক জনশূন্য স্থানের আবাদী আছে। আখেরাতের আবাদী বিবেক। প্রত্যেক মানুষের পেছনে এক কীর্তি থাকে, যার কারণে তার আলোচনা হয়। সিদ্দীকগণের এরূপ কীর্তি হল বিবেক। প্রত্যেক সফরের জন্যে একটি তাঁবু আছে। ঈমানদারদের তাঁবু বিবেক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কায়েম থাকে, তার বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, পূর্ণ বিবেকবান হয়ে নিজেকে উপদেশ দেয়, চক্ষুষ্মান হয়ে বিবেক অনুযায়ী সারা জীবন আমল করে এবং সাফল্য ও মুক্তি অর্জন করে। তিনি আরও বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে পূর্ণ বিবেকবান সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে অধিক ভয় করে এবং সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে যার দৃষ্টি সর্বাধিক ভাল হয়, যদিও নফল এবাদত কম করে।

বিবেকের স্বরূপ ও প্রকার

বিবেকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ লোক এদিকে লক্ষ্য রাখেনি, এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের একক সংজ্ঞা তালাশ করা উচিত নয়; বরং বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা আলাদা আলাদা ব্যক্ত করা দরকার । প্রথম অর্থ ঃ বিবেক এমন একটি গুণ, যদ্দ্বারা মানুষ সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে। অর্থাৎ, যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে চিন্তাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ ও গোপন কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবী এ অর্থ করেছেন। বিবেকের সংজ্ঞায় তিনি বলেন ঃ বিবেক এমন একটি শক্তি, যদ্দ্বারা মানুষ চিন্তাগত শাস্ত্র উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। এটা যেন একটা নূর, যা অন্তরে রাখা হয় এবং যদ্দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করার যোগ্য হয় । যেব্যক্তি এ সংজ্ঞা অস্বীকার করে এবং বিবেককে কেবল প্রকাশ্য শাস্ত্র জানার মধ্যে সীমিত করে, সে ইনসাফ করে না। কেননা, যেব্যক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে গাফেল অথবা যেব্যক্তি নিদ্রামগ্ন, তাদের উভয়কেই বিবেকবান বলা হয়; অথচ শাস্ত্র তখন তাদের মধ্যে অর্জিত থাকে না। কিন্তু কেবল শক্তি ও যোগ্যতা থাকার কারণেই তাদেরকে বিবেকবান বলা হয় ।

দ্বিতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন বালকের সত্তার

ভেতর পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৈধ বিষয়সমূহের বৈধ হওয়া এবং অসম্ভব বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান । উদাহরণতঃ এ বিষয়ের জ্ঞান, দুই একের দ্বিগুণ এবং এক ব্যক্তির একই সময়ে দু'স্থানে থাকা সম্ভব নয় । কোন কোন কালামশাস্ত্রী বিবেকের এ অর্থই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ বিবেক হচ্ছে কতক জাজ্বল্যমান জ্ঞান; যেমন সম্ভবপর বিষয়সমূহের সম্ভবপর হওয়ার এবং অসম্ভব বিষয়সমুহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান। এ অর্থও সঠিক । কেননা, এসব জ্ঞান বিদ্যমান আছে এবং এগুলোকে বিবেক বলাও ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু এর মধ্যে অনিষ্ট হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত শক্তিকে অস্বীকার করা এবং বলা, এসব জাজ্বল্যমান জ্ঞান ছাড়া বিবেক অন্য কিছু নয়। তৃতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা দৈনন্দিন অবস্থা অবলোকন ও তার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। কেননা, যেব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পারদর্শী ও ওয়াকিফহাল, তাঁকেই নিয়মানুযায়ী বিবেকবান বলা হয়। পক্ষান্তরে যে অভিজ্ঞতাগুণে গুণান্বিত নয়, তাকে জাহেল, স্থুলবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলা হয়। চতুর্থ অর্থ– উপরোক্ত স্বভাবগত শক্তি এতদূর হওয়া যে, বিষয়সমূহের পরিণাম জানতে থাকা এবং তাৎক্ষণিক আনন্দের প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করা ও দাবিয়ে রাখা। এ শক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে বিবেকবান বলা হয়। সে তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তির প্ররোচনা অনুযায়ী কাজ করে না। এ প্রকার বিবেক মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমেই সে জন্তু জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র।

সারকথা, প্রথম প্রকার বিবেক সবকিছুর মূল উৎস। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের শাখা এবং তার নিকটবর্তী । তৃতীয় প্রকারও দ্বিতীয় প্রকারের শাখা। কেননা, স্বভাবগত শক্তি ও জাজ্বল্যমান জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জিত হয়। চতুর্থ প্রকার শেষ ফলাফল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য । প্রথমোক্ত দু'প্রকার বিবেক সৃষ্টিগতভাবে অর্জিত হয় এবং শেষোক্ত দু'প্রকার অধ্যবসায়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বৎস! আমার মতে বিবেক দুপ্রকার– স্বভাবগত ও অধ্যবসায়গত। স্বভাবগত বিবেকের কোন প্রভাব অন্তরে না থাকলে অধ্যবসায়গত বিবেক দ্বারা কোন উপকার হয় না। এ হাদীসে প্রথমোক্ত বিবেক বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিবেকের চেয়ে মহৎ কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি। চতুর্থ প্রকার বিবেককেই এ হাদীসে বুঝানো হয়েছে। মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করে, তখন তুমি তোমার বিবেক দ্বারা নৈকট্য অর্জন কর। আবু দারদার উদ্দেশে

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তিতেও তাই বুঝানো হয়েছে– তুমি অধিক বিবেকবান হও, যাতে পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হতে পার। আবু দারদা আরজ করলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আমার জন্যে এটা কিরূপে সম্ভবপর হবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক, তাঁর ফরয কর্ম সম্পাদন কর এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। এতে দুনিয়াতে তোমার মাহাত্ম্য বাড়বে এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার নৈকট্য অর্জিত হবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর, উবাই ইবনে কা'ব ও আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সর্বাধিক আলেম কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক এবাদতকারী কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। আবার প্রশ্ন হল ঃ সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। তাঁরা আবার আরজ করলেন ঃ যেব্যক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী, বাহ্যতঃ শুদ্ধভাষী, দানশীল ও উচ্চ মার্যাদাশীল, সে-ই কি বিবেকবান নয় ? তিনি বললেন ঃ এগুলো তো পার্থিব জীবনের বিষয়। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীদের জন্যে আখেরাত ভাল। অতএব সে-ই বিবেকবান, যে মুত্তাকী– খোদাভীরু, যদিও সে দুনিয়াতে নীচ ও লাঞ্ছিত হয়। এক হাদীসে আছে– সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাঁর রসূলগণের সত্যায়ন করে এবং তাঁর এবাদত করে।

মনে হয়, মূল অভিধানে এবং ব্যবহারে আকল তথা বিবেক শব্দটি সেই মজ্জাগত শক্তির অর্থ বুঝানোর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তবে জ্ঞান ও শাস্ত্র অর্থে এর ব্যবহার হয় এজন্যে যে, জ্ঞান সে শক্তিরই ফলাফল। ফলাফল দ্বারাও কোন বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন, বলা হয়– এলেম হল খোদাভীতি আর সে ব্যক্তিই আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে। এখানে খোদাভীতি এলেমের ফল। এমনিভাবে অপ্রকৃতরূপে বিবেক শব্দটি তার ফলাফলের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য আভিধানিক আলোচনা নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিবেকের মধ্যে এই চারটি প্রকারই বিদ্যমান আছে। এ চারটির জন্যেই বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রথম প্রকার ছাড়া কোনটির অস্তিত্বে মতভেদ নেই। কিন্তু প্রথমটিও বিদ্যমান এবং সবগুলোর মূল– এটাই বিশুদ্ধ মত। সবগুলো জ্ঞান মজ্জাগত শক্তির মধ্যে আগত এবং প্রকাশ তখনই পায়, যখন কোন কারণ

এগুলোকে বিদ্যমান করে দেয়। এগুলো বাইরে থেকে শক্তির মধ্যে আসে না, বরং তাতে লুক্কায়িত রয়েছে। এরপর কোন কারণবশতঃ প্রকাশ পায়। উদাহরণতঃ কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে এবং একত্রিত হয়ে অনুভূত হয়। বাইরে থেকে কোন কিছু পানির জন্যে কূপে নিক্ষেপ করা হয় না। বাদামের মধ্যে তেল এবং গোলাপ ফুলের মধ্যে গন্ধ এমনিভাবে লুক্কায়িত থাকে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা আলা বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ

অর্থাৎ যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের ঔরস থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের ব্যাপারে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? তারা বলল ঃ অবশ্যই।

এখানে তওহীদের স্বীকারোক্তি নেয়ার অর্থ আধ্যাত্মিক স্বীকারোক্তি নেয়া– মৌখিক নয়। কেননা, মৌখিক দিক দিয়ে তো কেউ স্বীকার করে এবং কেউ করে না। নিম্নোক্ত আয়াতেও তেমনি অর্থ বুঝানো হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে, তবে তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। অর্থাৎ অবস্থা বিবেচনা করা হলে তাদের মন ও বাতেন এ সাক্ষ্য দেবে। আরও বলা হয়েছে–

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রত্যেক মানুষের মজ্জা স্বভাব।

কেননা, আল্লাহকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা তার মধ্যে খুব নিকটবর্তী। এজন্যই মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত– এক, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং আপন মজ্জাগত বিষয়টি ভুলে গেছে। সে হচ্ছে কাফের। দুই, যে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করে নিয়েছে। উদাহরণতঃ কোন সাক্ষী গাফিলতির কারণে ঘটনার কথা ভুলে যায়,

এরপর স্মরণ হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করার কথা অনেক জায়গায় এরশাদ করেছেন। যেমন– لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (যাতে তারা স্মরণ করে)– وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (এবং যাতে বুদ্ধিমানরা স্মরণ করে)– وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ (এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর এবং তাঁর সেই অঙ্গীকার স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের সাথে সম্পাদন করেছেন।)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (আর আমি কোরআনকে স্মরণ করার জন্যে সহজ করেছি। অতএব আছে কি কোন স্মরণকারী?)

বর্ণিত প্রকারকে "স্মরণ করা" বলা অবান্তর নয়। কেননা, স্মরণ করা দু'প্রকার– (১) যে বিষয় অন্তরে উপস্থিত ছিল, পরে বিলুপ্ত হয়েছে, তা স্মরণ করা এবং (২) মানুষের মজ্জায় আগত বিষয় স্মরণ করা। যেব্যক্তি বিবেকের নূর দ্বারা দেখে, তার সামনে এসব স্বরূপ সুস্পষ্ট। আর যে তকলীদ (অনুসরণ) ও শ্রবণের উপর ভরসা করে– কাশফ ও দেখার উপর নির্ভর করে না, তার জন্যে অবশ্য এসব বিষয় কঠিন। এ কারণেই তাকে এ ধরনের আয়াতে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। সে স্মরণ করার অর্থ এবং মনের স্বীকারোক্তির ব্যাখ্যায় নানা রকম আজগুবি কথাবার্তা বলে। হাদীস ও আয়াতসমূহে তার ধারণায় অনেক বিরোধ মনে হতে থাকে। কখনও এটা এত প্রবল হয়ে যায় যে, সে এসব হাদীস ও আয়াতকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে এবং এগুলোকে অনর্থক বাজে মনে করতে শুরু করে। বলাবাহুল্য, সে সেই অন্ধ ব্যক্তির মত, যে কোন গৃহে প্রবেশ করে। গৃহে যাবতীয় আসবাবপত্র সাজানো-গুছানো রয়েছে। কিন্তু অন্ধ আসবাবপত্রের উপর পিছলিয়ে পড়ে এবং বলে, এসব পথ থেকে দূরে সরিয়ে স্বস্থানে রাখা হয় না কেন? তাকে বলা হবে, আসবাব তো স্বস্থানেই সাজানো গুছানো ছিল, কিন্তু দোষ তোমার দৃষ্টি শক্তির। তেমনি অন্তর্দৃষ্টির ত্রুটির কারণে হাদীস ও আয়াতসমূহে বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। অথচ তাতে বিরোধ কিছুই নেই, দোষ বিবেকের। অন্তর্দৃষ্টির ক্ষতি চর্মচক্ষুর ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী ও বৃহৎ। কেননা, মন আরোহীর মত এবং দেহ বাহনস্বরূপ।

বলাবাহুল্য, আরোহীর অন্ধ হওয়ায় ঘোড়ার অন্ধ হওয়ার তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। অন্তর্দৃষ্টিকে বাহ্যিক দৃষ্টির সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

অর্থাৎ, "অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি।"

আরও বলেছেন ঃ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ এভাবেই আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখিয়েছি।

এর বিপরীতকে আল্লাহ তাআলা অন্ধত্ব বলে অভিহিত করেছেন ঃ

فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ -

অর্থাৎ "নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়।"

وَمَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا -

অর্থাৎ যে এ পৃথিবীতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

পয়গম্বরগণের জন্যে যেসব বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর কিছু বাহ্যিক দৃষ্টির এবং কিছু অন্তর্দৃষ্টির ফলে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সবগুলোকে দেখাই বলা হয়েছে। সারকথা, যার অন্তর্দৃষ্টি শক্তিশালী নয়, সে দ্বীনের সারবস্তু ও স্বরূপ লাভ করতে পারে না।

বিবেক কম-বেশী হওয়া

বিবেক কম-বেশী হতে পারে কিনা, এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। এখানে যথার্থ বিষযটি বর্ণনা করাই সমীচীন। এ সম্পর্কে প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার বিবেক ছাড়া সব বিবেকই কম-বেশী হতে পারে। একমাত্র বৈধ বিষয়সমূহের সম্ভবপর এবং অবৈধ বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়া এমন এক এলেম, যা কম-বেশী হতে পারে না।

উদাহরণতঃ যেব্যক্তি একথা জানবে, দুই একের বেশী, সে একথাও জানবে, একই বস্তুর দু'স্থানে থাকা অসম্ভব। কিন্তু অবশিষ্ট তিন প্রকার বিবেক কম-বেশী হতে পারে। যেমন– চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ, স্বভাবগত শক্তি এত বেশী হওয়া যে, খাহেশকে উচ্ছেদ করে দেয়। এতে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, বরং এতে কেবল এক ব্যক্তির অবস্থাও বিভিন্ন রূপ হয়। এ পার্থক্য কখনও খাহেশের পার্থক্যের কারণে হয়। কেননা, বিবেকবান ব্যক্তি কখনও কতক খাহেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং কতক ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না, যদিও তা ত্যাগ করা অসম্ভব নয়। যেমন– যুবক ব্যক্তি ব্যভিচার ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার পর যখন বিবেক পূর্ণতা লাভ করে, তখন তা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। আবার কখনও এ পার্থক্য এ কারণে হয় যে, এলেম দ্বারা খাহেশের ক্ষতি জানা যায়, তাতে পার্থক্য হয়। এ জন্যেই কতক ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বেঁচে থাকতে চিকিৎসক সক্ষম হয়, কিন্তু তার সমান বিবেকবান অন্য ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় না, যদিও তার মোটামুটি বিশ্বাস থাকে, এ খাদ্য ক্ষতিকর। কিন্তু চিকিৎসকের এলেম পূর্ণ বিধায় তার ভয়ও বেশী। এ ক্ষেত্রে ভয় তার খাহেশ উচ্ছেদ করার ব্যাপারে বিবেকের সিপাহী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুর্খের তুলনায় আলেম গোনাহ ত্যাগ করতে অধিক সক্ষম। কেননা, সে গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং এলেমের কারণে পার্থক্য হলে এ ধরনের এলেমকেও আমরা বিবেক বলেছি এ জন্যে যে, এ এলেম স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করে। অতএব এ এলেমের পার্থক্য হুবহু বিবেকের পার্থক্য। কখনও এ পার্থক্য কেবল বিবেকশক্তির পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে এ শক্তি বেশী হলে খাহেশকে উচ্ছেদও বেশী করবে।

বিবেকের তৃতীয় প্রকার অভিজ্ঞতাও কম-বেশী হয়। কতক লোক দ্রুত বিষয়বস্তু বুঝে ফেলে এবং তাদের অভিমত প্রায়ই সঠিক হয়। আর কতক লোক এরূপ হয় না। সুতরাং এ প্রকার বিবেকের পার্থক্য অনস্বীকার্য। প্রথম প্রকার যা মূল; অর্থাৎ, স্বাভাবিক শক্তি, এর পার্থক্যও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, এটা একটা নূরের মত, যা অন্তরের উপর চমকাতে থাকে। এর সূচনা হয় হিতাহিত জ্ঞানের বয়স থেকে। এর পর তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অবশেষে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের সময় পূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রভাত রশ্মি শুরুতে এমন গোপন থাকে যে,

তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সূর্যোদয়ের ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার রীতি হচ্ছে, তিনি ধাপে ধাপে আবিষ্কার করেন। সেমতে বালকের মধ্যে বালেগ হওয়ার সময় কামশক্তি একযোগে প্রকাশ পায় না; বরং অল্প অল্প করে প্রকাশ পায়। সুতরাং যেব্যক্তি এই স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি অস্বীকার করে, সে যেন বিবেকের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে। আর যেব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবেক তেমনি ছিল, যেমন কোন গেঁয়ো হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি গেঁয়ো থেকেও অধম। এ শক্তিতে তফাৎ না হলে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ কেন হত এবং কেউ এত কম মেধাবী কেন হত যে, অনেক বুঝালে এবং শিক্ষক গলদঘর্ম হলে পরে বুঝতে পারবে? আবার কেউ এত প্রখর মেধাবী কেন হত যে, সামান্য ইশারা দিলেই বুঝে ফেলে এবং কেউ এত কামেল কেন হত, স্বয়ং তার মন থেকেই বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ উথলে উঠে– ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করার প্রয়োজনই হয় না। আল্লাহ বলেন ঃ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ -

অর্থাৎ "তার জ্বালানি নিজে থেকেই প্রজ্বলিত হওয়ার উপক্রম হয়, যদিও তকে আগুন স্পর্শ করে না। আলোর উপর আলো।"

এরূপ কামেল লোক হলেন পয়গম্বরগণ। সূক্ষ সূক্ষ্ম রূপ ও বিষয়াদি স্বয়ং তাঁদের অন্তরে কারও শেখানো ছাড়া এবং কারও কাছ থেকে শুনা ছাড়া উন্মোচিত হয়ে যায়। একে ইলহাম বলে ব্যক্ত করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের বিষয়বস্তুই এ হাদীসে বর্ণন করেছেন ঃ রূহুল কুদুস (জিব্রাঈল) আমার মনে আরোপ করলেন, তোমরা যাকে ইচ্ছা বন্ধু কর, তার কাছ থেকে বিরহ হবে, যত ইচ্ছা জীবিত থাক, মরতে একদিন হবেই এবং যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান তোমরা পাবেই। নবীগণকে ফেরেশতাদের এভাবে খবর দেয়া ওহী নয়, বরং এটা আলাদা ব্যাপার। কেননা, ওহীর মধ্যে নবী কানে আওয়াজ শুনেন এবং চোখে ফেরেশতাকে দেখেন। ইলহামে এটা নেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) "আমার মনে আরোপ করেছেন" বলে বলেছেন – অন্য কোন শব্দ

বলেননি। ওহীর অনেক স্তর রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা এলমে মোআমালার জন্যে উপযুক্ত নয়, বরং এটা এলমে মোকাশাফার বিষয়বস্তু। তুমি এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি ওহীর স্তরসমূহ জানতে পারে, সে ওহীর মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। কেননা, কোন বিষয় জানা এক জিনিস আর তা পাওয়া অন্য জিনিস। উদাহরণতঃ কোন অসুস্থ চিকিৎসকের জন্যে স্বাস্থ্য রক্ষার সকল স্তর জেনে নেয়া অবাস্তব নয় এবং কোন পাপাচারী আলেমের পক্ষে আদলের স্তরসমূহ জানা অসম্ভব নয়, অথচ এ চিকিৎসকের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং এ আলেমের আদলের কোন অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নবুওয়ত ও ওলীত্ব সম্পর্কে জানবে, তার নবী বা ওলী হওয়া জরুরী নয়। মোট কথা, কোন কোন মানুষ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই কোন কোন বিষয় বুঝতে পারে, আবার অনেকে বাইরের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ ছাড়া বুঝে না এবং কেউ কেউ এমনও থাকে যাদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকারী হয় না। এটা ঠিক ভূমির মত। ভূমি তিন প্রকার হয়ে থাকে – (১) যাতে পানি সঞ্চিত থাকে এবং প্রবল হয়ে তা থেকে আপন আপনি ঝরণা প্রবাহিত হতে থাকে । (২) যাতে কূপ খনন করার প্রয়োজন হয়। কূপ খনন না করলে পানি বের হয় না। (৩) যা খনন করলেও পানি নির্গত হয় না– শুষ্কই থেকে যায়।

বিবেক যে কম-বেশী হয়, হাদীস থেকে এর প্রমাণ আদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত । তাঁর জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। এ বক্তব্যের শেষ ভাগে তিনি আরশের মাহাত্ম্য উল্লেখ করে বললেন ঃ "ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করল, ইলাহী, আপনি আরশের চেয়েও বড় কোন কিছু সৃষ্টি করেছেন কি ? এরশাদ হল ঃ হাঁ, বিবেক আরশের চেয়েও বড়। প্রশ্ন হল, এর পরিমাণ কতটুকু ? আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা এটা পুরাপুরি জানতে পারবে না। তোমরা বালুকার সংখ্যা জান কি? উত্তর হল, না। আল্লাহ বললেন ঃ আমি বিবেককেও বালুকার সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেছি। কেউ এক রতি পেয়েছে, কেউ দু'রতি, কেউ তিন রতি এবং কেউ চার রতি পেয়েছে। আবার কেউ আট সেরের কাছাকাছি এবং কেউ এক উটের বোঝাই পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে।"